গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭২ বর্ষ ১৫ সংখ্যা ২২ - ২৮ নভেম্বর ২০১৯ www.ganadabi.com আট পাতা মূল্য ঃ ২ টাকা

মানুষের কেনার ক্ষমতা তলানিতে

অর্থনীতি তো ডুববেই

মোদি সরকারের রাজত্বে গ্রাম-ভারতে বাস করা মানুষ জীবনের অতি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলিতেও খরচ করতে পারছে না। গত চার দশকে এই খরচ এতখানি কমে যাওয়ার নজির নেই। নুন চিনি তেল মশলা থেকে জামাকাপড় বাড়িভাড়া, এমনকি পড়াশোনার জন্যও আজ খরচ কমাতে বাধ্য হচ্ছে গ্রামে বাস করা মানুষ।

জাতীয় পরিসংখ্যান দপ্তর (এনএসও)-র ২০১৭-১৮ সালের সমীক্ষা রিপোর্টে এই তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। রিপোর্টটিকে চেপে রাখতে চেয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। সম্প্রতি এক সংবাদপত্রে তা ফাঁস হয়ে যায়। গত লোকসভা নির্বাচনের আগে বেকারত্ব বৃদ্ধির হার বেড়ে ৪৫ বছরে সর্বোচ্চ হয়েছে বলে দেখিয়েছিল যে এনএসও-র সমীক্ষা রিপোর্ট, সেটিকেও ঠিক একই রকম ভাবে চেপে রেখেছিল সরকার। সে রিপোর্টও সংবাদপত্রে ফাঁস হয়েছিল।

দেশের জনসংখ্যার তিন ভাগের দু'ভাগই বাস করে গ্রামে। তাঁদের জীবনের উপর আর্থিক মন্দা কী মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে, খরচে মানুষের এই অক্ষমতা তারই প্রমাণ। রিপোর্ট অনুযায়ী দানাশস্য কেনা গ্রামে কমেছে ২০.৪ শতাংশ, শহরে ৭.৯ শতাংশ। চিনি নুন মশলা কেনার পরিমাণ গ্রামে কমেছে ১৬.৬ শতাংশ, শহরে ১৪.২ শতাংশ। খাদ্যদ্রব্য সহ জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলিও মানুষ কিনছে না কেন? তারা কি সন্তান সহ পরিবারের মুখে দু'বেলা পেটভরে খাবারটুকু তুলে দিতে চায় না, সন্তানের শিক্ষার পিছনে খরচ করতে চায় না? এইসব অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্র কেনার মতো আয় মানুষের নেই বলেই খরচ এত কমে গেছে। এটা বুঝতে অর্থনীতির বিশেষজ্ঞ হওয়ার দরকার পড়ে না।

> **সাধারণ মানুষের কেনার ক্ষমতা না বাড়লে বাজার চাঙ্গা হয় না। বাজার না থাকলে পুঁজিপতিদের হাতে যত পুঁজিই থাকুক, তারা বিনিয়োগ করবে না। বাজার অর্থনীতির এই সংকট বাজারেরই তৈরি।**

এই রিপোর্ট সরকারের গত বছর জুনে প্রকাশ করার কথা ছিল। কিন্তু নির্বাচনের আগে এই রিপোর্ট বের করার সাহস করেনি সরকার। তা হলে গত পাঁচ বছরে বিজেপি কেমন 'আচ্ছে দিন' এনেছে, সেটা বেরিয়ে পড়ত। সংবাদমাধ্যমে রিপোর্টটি ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ও প্রকল্প রূপায়ণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়, অনেক খামতি থাকায় রিপোর্টটি প্রকাশ করা হয়নি।

স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে, কী এমন খামতি

দুয়ের পাতায় দেখুন

ধানের সহায়ক মূল্য ২৫০০ টাকা কুইন্টাল করার দাবি

পূর্ব বর্ধমানের কৃষি ও কৃষক বাঁচাও কমিটির ডাকে ৫ নভেম্বর বর্ধমানে কার্জন গেটে কৃষক বিক্ষোভ। ধানের উপযুক্ত সহায়ক মূল্য, কৃষিঋণ মকুব, চাষির কাছ থেকে সরাসরি ধান, আলু ইত্যাদি ফসল কেনা, কৃষিতে বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ ইত্যাদি দাবিতে জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

কাশ্মীরের চাষিদের শোচনীয় অবস্থা দেখে এলেন কৃষক সংগঠনের নেতারা

কেমন আছেন কাশ্মীরের আপেল, চেরি, ন্যাসপাতি, আঙুর চাষিরা? কেমন আছেন কাশ্মীরের মেষপালকরা? গত আগস্ট মাস থেকে সেনা ব্যূহে অবরুদ্ধ কাশ্মীর। প্রথম দু'মাস টেলিফোন ব্যবস্থা ছিল পুরোপুরি বন্ধ। এখন কিছুটা শিথিল হলেও ইন্টারনেট পরিষেবা চালু হয়নি। ভূস্বর্গ এখন পুরোপুরি কেন্দ্রীয় সরকারের কব্জায়। গণতান্ত্রিক অধিকার বলতে অবশিষ্ট কিছু নেই। বিরোধী নেতারা গৃহবন্দি। সাংবাদিকদের পায়েও নানা নিষেধের বেড়ি।

অবরুদ্ধ এই কাশ্মীরে কেমন চলছে কৃষিপণ্যের বিক্রিবাটা? কী অবস্থা পশুপালন ও কৃষিপণ্য নির্ভর

দুয়ের পাতায় দেখুন

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পলিটবুরো সদস্য এবং অল ইন্ডিয়া কিষান খেতমজদুর সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড সত্যবান (বাঁ দিক থেকে দ্বিতীয়) সহ প্রতিনিধি দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ

দিল্লিতে এনএমসি বিরোধী বিশাল কনভেনশন

জনস্বাস্থ্য ও মেডিকেল শিক্ষার বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার জনমতের তোয়াক্কা না করে তৈরি করেছে ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন অ্যাক্ট। যার মাধ্যমে ইতিমধ্যেই গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত ন্যাশনাল মেডিকেল কাউন্সিল ভেঙে দেওয়া হয়েছে। তৈরি করা হয়েছে স্বৈরতান্ত্রিক ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন— যার বেশিরভাগ সদস্যই সরকারি আমলা এবং সকলেই সরকার মনোনীত। এর মাধ্যমে দেশের মেডিকেল শিক্ষা এবং জনস্বাস্থ্যকে সম্পূর্ণরূপে কুক্ষিগত করবে কেন্দ্রীয় সরকার।

মেডিকেল শিক্ষার স্বাধিকার হরণকারী এবং জনস্বাস্থ্য ও মেডিকেল শিক্ষাকে কর্পোরেট পুঁজি নিয়ন্ত্রিত ব্যবসার লক্ষ্যে তৈরি এই দানবীয় কালা আইনের বিরুদ্ধে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় ৯ নভেম্বর দিল্লিতে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের উদ্যোগে একটি সর্বভারতীয় কনভেনশনের আয়োজন করা হয়।

দিল্লি সহ দেশের ১৮টি রাজ্য থেকে মেডিকেল ছাত্র ও চিকিৎসক প্রতিনিধিরা কনভেনশনে যোগ দেন। তাঁরা এন এম সি-র বিরুদ্ধে জোরালো বক্তব্য রাখেন এবং এই কালা আইন বাতিলের দাবি তোলেন।

কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শল্যচিকিৎসক এবং জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের নেতা ডাঃ সুভাষ দাশগুপ্ত। বিশিষ্ট বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ মৃদুল দাগা (দিল্লির মৌলানা আজাদ মেডিকেল কলেজের প্রফেসর ডিরেক্টর), ডাঃ সন্দীপ মিশ্র (দিল্লি এইমসের কার্ডিওলজি বিভাগের অধ্যাপক), ডাঃ তরুণ মণ্ডল (প্রাক্তন সাংসদ, জনস্বাস্থ্য ও সামাজিক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা ও মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সর্বভারতীয় সহ সভাপতি), ডাঃ অশোক সামন্ত (হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের

হরিয়ানায় শিক্ষা কনভেনশন

শিক্ষার বেসরকারিকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ, সাম্প্রদায়িকীকরণ ও কেন্দ্রীকরণের প্রতিবাদে ৩ নভেম্বর হরিয়ানার রোহতকে এআইডিএসও-র উদ্যোগে শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন সংগঠনের প্রাক্তন সর্বভারতীয় অফিস সম্পাদক চঞ্চল ঘোষ। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি প্রশান্ত কুমার।

অর্থনীতি তো ডুববেই

একের পাতার পর

ছিল যে কারণে সরকার রিপোর্টটি খারিজ করে দিল? এবারের প্রকাশিত রিপোর্টের হিসাব মতো দেশের প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ মানুষই এখন দারিদ্রসীমার নিচে। ফলে সরকারের 'সব কা বিকাশের' তৈরি করা ভাবমূর্তিতে কালি মাখামাখি হবে বলেই যে এই রিপোর্টও চেপে রাখা হয়েছিল তা বুঝতে অসুবিধা হয় কি?

কালো টাকা উদ্ধারের নামে মোদি সরকারের নোট বাতিল এবং জিএসটি চালুর সিদ্ধান্ত অর্থনীতির উপর এক মারাত্মক আক্রমণ হিসাবে নেমে এসেছিল। ছোট ও মাঝারি সংস্থাগুলি এখনও সেই আক্রমণের ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। বাস্তবে বিজেপি সরকারের জনবিরোধী আর্থিক নীতিই মানুষের কেনার ক্ষমতাকে এমন করে টেনে নামানোর জন্য দায়ী। পুঁজিবাদী শোষণ যে মারাত্মক আকারে দেশের মানুষের উপর নামিয়ে আনা হয়েছে, কেনার ক্ষমতা ক্রমাগত সংকুচিত হয়ে যাওয়া তারই ফল। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যে কৃষির সঙ্গে যুক্ত তার অবস্থা তীব্র পুঁজিবাদী শোষণে চরম সংকটে। চাষিরা ধান পাট আলু তুলো আখ প্রভৃতি প্রতিটি কৃষি উৎপাদনের ন্যায্য দাম থেকে দশকের পর দশক ধরে বঞ্চিত হয়ে চলেছে। কৃষক আত্মহত্যার বিরাম নেই। গ্রামীণ মানুষের জীবনের উপর এর মারাত্মক প্রভাব পড়েছে। মন্দার ফলে কলকারখানা যেমন শয়ে শয়ে বন্ধ হয়ে চলেছে তেমনই চালু কারখানাগুলিতেও লাখে লাখে শ্রমিক-কর্মচারী ছাঁটাই হয়ে চলেছে। এই বিরাট সংখ্যক মানুষের কেনার ক্ষমতা হারিয়ে যাওয়ার কারণেই আজ এই ভয়ঙ্কর মন্দা।

জনগণের কেনার ক্ষমতা বজায় রাখতে তাদের জন্য নিয়মিত রোজগারের ব্যবস্থা করা ছিল এই মুহূর্তে সরকারের বড় দায়িত্ব। বাস্তবে সরকার কী করছে? মানুষের কেনার ক্ষমতা বাড়ানোর কোনও উদ্যোগ নিয়েছে? না। ফসলের ন্যায্য দাম দূরের কথা, নামমাত্র দাম বাড়াতেও চাষিদের বার বার রাস্তার আন্দোলনে নামতে হচ্ছে। বেকারদের কর্মসংস্থানের কোনও ব্যবস্থা নেই। বিপরীতে মন্দার সংকট থেকে রেহাই দিতে পুঁজিপতিদের হাজার হাজার কোটি টাকা ঢেলে দিয়ে সরকার প্রমাণ করেছে, জনস্বার্থ নয়, পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষাই সরকারের একমাত্র উদ্দেশ্য। সম্প্রতি সরকার কর্পোরেট সংস্থাগুলিকে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার কোটি টাকার কর ছাড় দিয়েছে। আবাসন শিল্পের মালিকদের জন্য ২৫ হাজার কোটি টাকার ফান্ড গড়ে দিয়েছে সরকার। ব্যাঙ্কগুলি থেকে পুঁজিপতিদের লোপাট করে দেওয়া হাজার হাজার কোটি টাকা সরকার জনগণের করের টাকা থেকে ব্যাঙ্কগুলিকে পুষিয়ে দিয়েছে। দফায় দফায় ব্যাঙ্কের সুদের হার কমিয়েছে। দাবি করেছে, এর ফলে বিনিয়োগ বাড়বে। অথচ সাধারণ মানুষের কেনার ক্ষমতা না বাড়লে বাজার কখনও চাঙ্গা হয় না। বাজার চাঙ্গা না হলে পুঁজিপতিদের হাতে যত পুঁজিই থাকুক, তারা বিনিয়োগ করবে না। এই সংকট পুঁজিপতি শ্রেণিরই তৈরি, তাদের নির্মম শোষণের ফল।

মহান কার্ল মার্কস বহু আগে তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কার 'উদ্বৃত্ত মূল্যের' তত্ত্বে দেখিয়ে দিয়েছেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মালিক কীভাবে শ্রমিককে তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে মুনাফা করে এবং তার পুঁজি গড়ে তোলে। তিনি দেখান, কীভাবে ক্ষুদ্রপুঁজিকে বৃহৎ পুঁজি গিলে খায় এবং এই প্রক্রিয়ায় একচেটিয়া পুঁজির জন্ম হয়। উল্টো দিকে শ্রমজীবী মানুষকে ক্রমাগত শোষণ করতে করতে কীভাবে পুঁজিপতি শ্রেণি তাদের ছিবড়ে করে দেয় এবং পরিণতিতে তাদের কেনার ক্ষমতা তলানিতে এসে ঠেকে। এই কেনার ক্ষমতা কমে যাওয়া মানেই পুঁজিবাদী বাজার সংকুচিত হওয়া। বাজার সংকুচিত হওয়া মানেই উৎপাদিত পণ্যের গুদামে জমে যাওয়া। ফলে সমাজ জুড়ে মন্দা ছড়িয়ে পড়া। সাম্রাজ্যবাদের প্রথম যুগে মন্দা আসত ঢেউয়ের মতো। মন্দার পর উৎপাদন আবার স্থিতিশীল হত। তারপর মন্দা ঘন ঘন হতে থাকল। এক সময়ে এসে মন্দা এবেলা-ওবেলার সংকটে পরিণত হল। আর এখন তো মন্দা স্থায়ী রূপ নিয়েছে।

পুঁজিপতি শ্রেণি মন্দা এড়াতে একের পর এক টোটকা প্রয়োগ করে চলেছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদ কেইনস একসময় পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে বাঁচাতে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যে কোনও উপায়ে জনগণের হাতে টাকা দিয়ে, কাজ দিয়ে জনগণের কেনার ক্ষমতা বাড়ানোর দাওয়াই দিয়েছিলেন। তা-ও যখন কাজে এল না তখন এল বিশ্বায়নের দাওয়াই— উদারিকরণ-বেসরকারিকরণের নামে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে বেসরকারি মালিকদের হাতে জলের দামে কিংবা বিনামূল্যে তুলে দেওয়া। কিন্তু কোনও টোটকাই পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার সংকট কাটাতে পারল না। এই অবস্থায় দেশে দেশে পুঁজিপতি শ্রেণি মন্দার সমস্ত বোঝা চাপিয়ে দিতে থাকল শোষিত সাধারণ মানুষের উপরই। ফলে মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, ছাঁটাই মারাত্মক আকার নিয়েছে। এই পরিস্থিতি শুধু ভারতেই নয়, গোটা বিশ্বজুড়ে। সর্বত্রই শোষিত মানুষ পুঁজিবাদী শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে। রাস্তায় রাস্তায় পুলিশ-মিলিটারির সাথে ব্যারিকেড ফাইট করছে। ভারতের শাসকরা মানুষের ক্ষোভকে বিপথগামী করতে ধর্ম-জাতপাত-মন্দির-মসজিদ-এনআরসি প্রভৃতি জিগির তুলে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করছে। কিন্তু মানুষের আর্থিক সংকট যেভাবে তীব্র আকার নিয়েছে, তাতে মানুষকে এই মিথ্যা জিগিরে বেশি দিন ভুলিয়ে রাখা যাবে না। শোষিত মানুষ পুঁজিবাদী শোষণের জোয়াল থেকে মুক্ত হতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলনে ফেটে পড়বেই। শুধু দরকার লড়াইয়ের সঠিক শক্তিকে চিনতে পারা।

শ্রমিক স্মরণ ঃ *কাশ্মীরে নিহত ৫ শ্রমিকের স্মরণে ২ নভেম্বর কোচবিহারের সাতমাইল বাজারে স্মারক বেদিতে মাল্যদান করেন এআইইউটিইউসি-র জেলা সভাপতি নৃপেন কার্যী, আলু-পাট-ধান চাষি সংগ্রাম কমিটির সভাপতি কুপেন বর্মন, রিক্সা শ্রমিক মানিক দাস, টোটো চালক আইনুল মিঞা প্রমুখ।*

হুগলিতে আইসিডিএস কর্মীদের বিক্ষোভ সমাবেশ ও জেলাশাসক দপ্তরে স্মারকলিপি প্রদান। ১৮ নভেম্বর

কাশ্মীরের চাষিদের শোচনীয় অবস্থা

একের পাতার পর

ছোট ব্যবসার? ৭ নভেম্বর অকালে ভারি তুষারপাতে কী অবস্থাই বা সেখানকার চাষিদের? বিষয়টি খতিয়ে দেখতে নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে অল ইন্ডিয়া কিষান সংঘর্ষ কো-অর্ডিনেশন কমিটির এক প্রতিনিধি দল কাশ্মীরে যান। সারা দেশের ২৫০টি কৃষক সংগঠনের যুক্ত মঞ্চ এটি। এই মঞ্চের অন্যতম শরিক অল ইন্ডিয়া কিষান খেতমজদুর সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি তথা এসইউসিআই(সি) পলিটবুরো সদস্য কমরেড সত্যবান প্রতিনিধিদলে ছিলেন।

৭ সদস্যের এই প্রতিনিধিদল ৩ দিন কাশ্মীরের বিভিন্ন অঞ্চলে যান। তাঁরা ফলচাষিদের বিভিন্ন সংগঠন এবং কাশ্মীরের বণিক সভার সঙ্গে বৈঠক করেন। কুলগামে তাঁরা বিভিন্ন কৃষক ও ফার্ম লিডারদের নিয়ে গণশুনানির ব্যবস্থাও করেন। গান্দারবাল, পামপোল, পুলওয়ামা, কুলগাম এবং অনন্তনাগে চাষিদের খামারগুলি ঘুরে দেখে তাঁদের উপলব্ধি, চাষিদের অবস্থা শোচনীয়।

হর্টিকালচার অর্থাৎ ফল-ফুল-শাকসব্জি উৎপাদন কাশ্মীরের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড। গত বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগে উৎপাদন মার খেয়েছে। এবার ভাল ফলন হওয়ায় চাষিরা আশা করেছিলেন ক্ষতি পুষিয়ে যাবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার জম্মু-কাশ্মীরের রাজ্য মর্যাদা কেড়ে নিয়ে, ৩৭০ ধারা বাতিল করে, কাশ্মীরবাসীকে সামরিক ঘেরাটোপে বন্দি করে যে পরিস্থিতি তৈরি করেছে তাতে কৃষি বিপণন ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। আগস্ট মাসে যখন আঙুর-ন্যাসপাতি-চেরি ফল বাজারে ওঠে, ঠিক সেই সময় কাশ্মীরকে কার্যত বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হল গোটা ভারত থেকে। ব্যবসায়ীরা বাগানে যেতে পারলেন না ফল কেনার জন্য, কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত ফল বাজারে আনতে পারলেন না। সবই পচে নষ্ট হল চোখের সামনে। মারাত্মক আর্থিক ক্ষতির মধ্যে পড়লেন কৃষকরা।

সেপ্টেম্বর মাস আপেল তোলার সময়। কিন্তু চাষিরা খামারে যেতে পারলেন না আপেল তোলার জন্য। একদিকে ভারতীয় সেনাবাহিনী, অন্যদিকে জঙ্গিদের অত্যাচার। কোণঠাসা কৃষকরা। এর মধ্যেও যতটুকু তুলতে পেরেছেন বিক্রি করতে পারেননি। সেনাবাহিনী চাষিদের খামারে ট্রাক নিয়ে যেতে বাধা দিয়েছে। ফলে ক্ষুব্ধ কৃষকরা রাস্তায় আপেল ডাঁই করে ফেলে রেখে, কপাল চাপড়াচ্ছেন। ফল পরিবহণের জন্য কোথাও কোথাও ট্রাক মিললেও ভাড়া এত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যে তা চাষিদের পক্ষে নেওয়া মুশকিল। অনেক ক্ষেত্রে বেশি ভাড়া দিয়ে ট্রাক নেওয়া হলেও রাস্তা অবরোধের কারণে ট্রাকের মধ্যেই ফল নষ্ট হয়ে গেছে।

এই অবস্থায় ৭ নভেম্বর গোটা উপত্যকা জুড়ে ভারি তুষারপাত, ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করেছে। তুষারপাতে আপেল গাছের এত ক্ষতি হয়েছে যে, আগামী ৩-৪ বছর ভাল ফলন হবে না। অর্কিড ফুলেরও মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। জাফরান গাছের এত ক্ষতি হয়েছে যে চাষিরা বলছেন, উৎপাদন অন্যান্য বছরের তুলনায় ১৫ শতাংশও হবে না। এত ক্ষয়-ক্ষতি সত্ত্বেও কাশ্মীরকে দুর্যোগ কবলিত হিসাবে ঘোষণা করা হয়নি। এমনকি ক্ষতির কোনও সমীক্ষাও করা হয়নি। শুধু কৃষক নন, পশুপালকরাও মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন। এ বছর উপত্যকা জুড়ে কার্যত শোকের ছায়া। শ্মশানের মতো নিঃস্তব্ধতা। শান্তি নেই। আনন্দ নেই। এবার বকরঈদ মানুষ নমো নমো করে সেরেছেন। ফলে ছাগল-ভেড়ার বিপণনও মার খেয়েছে। সব মিলিয়ে কাশ্মীরের অর্থনীতি বিপন্ন।

কাশ্মীর সফর করে প্রতিনিধিবৃন্দ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানান— কাশ্মীরকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত ঘোষণা করে জাতীয় বিপর্যয় রিলিফ তহবিল থেকে কৃষকদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, হর্টিকালচার বিশেষজ্ঞদের দিয়ে ক্ষয়-ক্ষতির সমীক্ষা করতে হবে। প্রতিনিধিবৃন্দ জম্মু-কাশ্মীরের কৃষকদের এই দুর্দশায় তাঁদের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেন। তাঁরা বলেন, অল ইন্ডিয়া কিষাণ সংঘর্ষ কো-অর্ডিনেশন কমিটি দেশব্যাপী যে আন্দোলন করছে, সেই আন্দোলনে কাশ্মীরের কৃষকরাও সামিল হোন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন কমিটির কনভেনর— ভিএম সিং, রাজু সেট্টি (স্বাভিমানী খেতকারী সংগঠক), যোগেন্দ্র যাদব (জয় কিষান আন্দোলন), কৃষ্ণ প্রসাদ (এআইকেএস), প্রেম সিং গেহলট (অল ইন্ডিয়া কিষান মহাসভা), সত্যবান (অল ইন্ডিয়া কিষান খেতমজদুর সংগঠন), স্বস্তিক (স্বাভিমানি খেতকারী সংগঠন)।

কাশ্মীরী জনজীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে বিজেপি সরকার

আশঙ্কা ছিলই। এস ইউ সি আই (সি) দল সুস্পষ্টভাবে বলেও ছিল যে, একতরফা ভাবে জম্মু-কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা রদ এবং রাজ্য হিসাবে তার মর্যাদা কেড়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত কাশ্মীরবাসীকে আহত করবে, তাদের বাকি ভারত থেকে দূরে ঠেলে দেবে। এর সুযোগ নেবে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি (৬ আগস্ট, ২০১৯, কেন্দ্রীয় কমিটির বিবৃতি)।

দেশের বহু মানুষ এমনকি জন্মসূত্রে কাশ্মীরী পণ্ডিত প্রাক্তন এয়ার ভাইস মার্শাল কপিল কাক সহ কাশ্মীরের ৬৪ জন বিশিষ্ট নাগরিক সরকারের কাছে লেখা আবেদনে বলেছিলেন, এই পদক্ষেপ কাশ্মীরবাসীর কাছে একটা আঘাত হিসাবেই আসবে।

সরকার শোনেনি সে কথা। অথচ এই নির্মম সত্যকেই প্রাণ দিয়ে প্রমাণ করে যেতে হল আপেল বাগানে কাজ করতে যাওয়া পাঁচ পরিযায়ী শ্রমিককে। ২৯ অক্টোবর সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে শেষ হয়ে গেল এতগুলি তাজা প্রাণ। আহত আরও দু'জন। ঘটনার জেরে তীব্র আতঙ্ক আর মানসিক আঘাতে জর্জরিত হলেন আরও কয়েক শত শ্রমিক। তাঁদের অনেকেই কাশ্মীর ছাড়ছেন। তারপরেও চলেছে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ, তাতে মহিলা সহ হতাহত অনেকেই।

কাশ্মীর তো এখন সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে। সেখানকার অধিবাসী, বাইরে থেকে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিক থেকে শুরু করে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জীবন-জীবিকা রক্ষার দায়িত্ব তো তাদেরই। সমস্ত দোকান-বাজার বন্ধ, মানুষের রোজগার নেই। পর্যটকদের কাশ্মীরে যাওয়ার সম্ভাবনা অদূর ভবিষ্যতে নেই। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের মানুষ কীভাবে বেঁচে থাকবে, তা নিয়ে সরকারের কোনও মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। ৩১ অক্টোবর জম্মু-কাশ্মীর পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা হারিয়ে একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত হল। তার থেকে আলাদা হয়ে গেল লাদাখ। সেই উপলক্ষে আনন্দিত প্রধানমন্ত্রী যখন বলছেন, কাশ্মীর আর বাকি ভারতের মধ্যে ৩৭০ ধারাই দেওয়ালের মতো দাঁড়িয়েছিল, আমি সেই দেওয়াল সরিয়ে দিয়েছি— ঠিক সেই সময় কাশ্মীরবাসী বন্দি কাঁটাতারের বেড়া আর পুলিশ-সিআরপিএফ-মিলিটারির বেষ্টনীতে। কোথায় তাঁদের 'দেওয়াল ভাঙার' আনন্দ? বরং এক অদ্ভুত নীরবতা আজ বিরাজ করছে কাশ্মীর জুড়ে। এই নীরবতাকে দেখিয়েই সরকার বলছে— কাশ্মীর স্বাভাবিক। আর ঠিক সেই সময় জীবনের ছন্দহারা কাশ্মীরের মানুষের সাথে একটু কথা বলার সুযোগ যাঁরা পাচ্ছেন তাঁদের অভিজ্ঞতা হল, এ নীরবতা বড়ই বাঙ্ময়। এর মধ্যেই ফুটে উঠছে তীব্র প্রতিবাদের স্বর।

সাংবাদিকদের চোখে কাশ্মীরের কী ছবি ফুটে উঠেছে দেখা যাক। 'জম্মু কাশ্মীর প্রশাসনের এক অফিসার বলছেন, ঘিরে রেখে ক্লান্ত করে দিয়ে মাথা নিচু করানোর এই নীতি আদৌ সফল হবে কি না আমরা জানি না। কিন্তু এটা যে কোনওমতেই স্বাভাবিকতা নয়, তা নিশ্চিত বলা যায়,' লিখেছেন বর্ষীয়ান সাংবাদিক পি বৈদ্যনাথন আয়ার এবং আদিল আখজের (ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ১৪ অক্টোবর, ২০১৯)। সকালবেলা কিছুক্ষণের জন্য দোকান বাজার খুলছে, আবার বেলা ১১টার পর সব বন্ধ। বন্ধ গণপরিবহণ, স্কুল-কলেজ। সাংবাদিকরা সরকারি আমলাদের উদ্ধৃত করে বলেছেন, কাশ্মীরে চলছে 'মানুষের স্বআরোপিত কারফিউ' (ওই)। সরকার নিজেও ১১ অক্টোবর কাশ্মীরের সব সংবাদপত্রের প্রথম পাতা জুড়ে বিজ্ঞাপন দিয়ে বলেছে, মানুষ নিজে থেকেই দোকান খুলছেন না, গণপরিহণ ব্যবহার করছেন না, সরকারের কাছে আসছেন না। প্রশ্ন করেছে, 'কীসের ভয়'? (এনডি টিভি, ১১ অক্টোবর ২০১৯) অর্থাৎ সরকারই মেনে নিয়েছে সরকারের উপর আস্থা হারাচ্ছে কাশ্মীরের জনগণ।

কাশ্মীর থেকে লাদাখকে আলাদা করে দেওয়ায় লাদাখের রাজধানী লেহ-তে আনন্দের ছবি দেখিয়েছে সরকার। কিন্তু সেখানেও চাপা আতঙ্ক, বহিরাগতদের হাতে জমি চলে যাওয়ার আশঙ্কায় ভুগছে মানুষ। লাদাখের অন্তর্গত কারগিলের মানুষ মনে করছেন, আগে জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভায় তাঁদের অন্তত একজন রাজনৈতিক প্রতিনিধি থাকতেন, এখন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হওয়ায় সে সুযোটুকুও রইল না। কাশ্মীর রাজ্য ভাগ এবং ৩৭০ ধারা রদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের 'জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি' গড়ে উঠেছে কারগিলে (নিউজ ক্লিক, ১ নভেম্বর ২০১৯)।

কাশ্মীরের জনগণ একদিন রুখে দাঁড়িয়েছিল পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে। এই কাশ্মীরী জনগণ ভারতভুক্তির পক্ষে লড়াই করেছে একদিকে রাজা হরি সিং, অন্যদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্র ও পাকিস্তানের ধর্মীয় উস্কানির বিরুদ্ধে। আজ স্বৈরাচারী কায়দায় একতরফা সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়ে বিজেপি সরকার তাদেরই দূরে ঠেলে দিচ্ছে। বিচ্ছিন্নতাবাদীরা এই আহত মানসিকতাকে আশ্রয় করে তাদের শক্তি বাড়ানোর সুযোগ পেয়েছে। ইতিহাস বলে, ভারতের স্বাধীনতার সময় স্বতন্ত্র ধারায় জাতিসত্তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে অবস্থান করা কাশ্মীরের ভারতভুক্তির বাস্তব প্রয়োজনেই এসেছিল সংবিধানের ৩৭০ ধারা। কাশ্মীরের অবিসংবাদী নেতা শেখ আবদুল্লা সেখানকার গণপরিষদে অনেক আশা নিয়ে বলেছিলেন, "...আমাদের জনগণের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য এবং সৃজনীক্ষমতা অনুযায়ী আমাদের দেশকে গড়ে তোলার স্বাধীনতা যাতে আমাদের হাতে থাকে, তা সুনিশ্চিত করার জন্য স্বায়ত্তশাসন সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করার সাথে সাথে, ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে যথোপযুক্ত সাংবিধানিক বোঝাপড়া গড়ে তুলে এই মহান কর্তব্যে ভারতীয় ইউনিয়নের সাহায্য ও সহযোগিতা চাওয়া এবং ...একইসঙ্গে ভারতীয় ইউনিয়নকে আমরা দিতে পারি আমাদের পূর্ণ সাহায্য ও সহযোগিতা।... এই শর্ত এবং বোঝাপড়ার ভিত্তিতেই ৩৭০ ধারা প্রণীত হয়েছে এবং সংবিধানে জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য বিশেষ মর্যাদার ব্যবস্থা করা হয়েছে।" ১৯৫০ সালে মুম্বইয়ের 'কারেন্ট' পত্রিকায় ঔপন্যাসিক ও চিত্রনাট্যকার খাজা মহম্মদ আব্বাস লিখছেন,'... ভারত সরকার যদি কাশ্মীরের মন জয় করতে চায়, তাহলে নীতিনিষ্ঠভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে এবং শেখ

কাশ্মীরের সন্তানহারা বাবা-মায়েরা

আবদুল্লার অর্থনৈতিক কর্মসূচি তাদের আঁকড়ে ধরতে হবে' (রামচন্দ্র গুহ, গান্ধী উত্তর ভারত)। কিন্তু একেবারে প্রথম থেকেই কংগ্রেস পরিচালিত তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার ৩৭০ ধারাকে বারবার লঙ্ঘন করেছে। শেখ আবদুল্লাকে দীর্ঘ সময় ধরে গ্রেপ্তার করে রেখেছে। বাস্তবে সংবিধান প্রণীত হওয়ার পর থেকে প্রায় কোনওদিনই এই ধারার পূর্ণ মর্যাদা কেন্দ্রীয় সরকার দেয়নি। বরং একের পর এক পদক্ষেপ করে ১৯৬৪-৬৫-র মধ্যেই এই ধারার প্রায় সমস্ত অধিকার কেন্দ্রীয় সরকার কেড়ে নিয়েছে। এই পদক্ষেপ কাশ্মীরী জনগণের কাছে বিশ্বাসভঙ্গ হিসাবেই এসেছে। যা তাদের গোটা ভারতের সাথে এক হয়ে মিলবার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই আজ প্রয়োজন ছিল কাশ্মীরী জনগণের এই স্বায়ত্তশাসনের অধিকারকে মর্যাদা দিয়ে ৩৭০ ধারার পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগ। একমাত্র এই পথেই কাশ্মীরের মানুষকে আশ্বস্ত করা যেত যে, তাদের অধিকার এবং মর্যাদা রক্ষায় সরকার দায়বদ্ধ। একমাত্র এর মধ্য দিয়েই বিচ্ছিন্নতাবাদী, মৌলবাদী এবং পাকিস্তানের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদী শক্তিগুলিকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রক্রিয়া শুরু করা যেত। কিন্তু সরকার সে পথে যায়নি। এর ফলে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা এবং সন্ত্রাসবাদই শক্তিলাভ করছে।

আজ প্রচার চলছে ৩৭০ ধারা ভারতের সংবিধানের একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা। ফলে সরকার এই ধারা রদ করে ভুল কিছু করেনি। কিন্তু সংবিধান বিশেষজ্ঞ রাজীব ধাওয়ান এবং জম্মু ও কাশ্মীর হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি বি এ খানের মতে ৩৭০ ধারার অবলুপ্তি ভারতের সাথে জম্মু ও কাশ্মীরের সংযুক্তি চুক্তিকেই (ইনস্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাকসেশন) অকার্যকরী করে দেয় (নিউজ-১৮, ৫.০৮.১৯)। জম্মু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ অমিতাভ মুত্তুর মতে, ৩৭০ ধারার ৩ নম্বর উপধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি ৩৭০ ধারা রদের বিজ্ঞপ্তি জারি করতে পারেন একমাত্র তখনই যদি তা আগেই কাশ্মীরের গণপরিষদ দ্বারা অনুমোদিত হয় (ওই)। সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট নমিত সাক্সেনার মতে কাশ্মীরের গণপরিষদের (কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেমব্লি) সিদ্ধান্ত ছাড়া রাষ্ট্রপতির জারি করা আদেশ বলে ৩৭০ ধারা বাতিল হয় না। কাশ্মীরের কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেমব্লি বহুদিন আগেই বাতিল করে বিধানসভা এনেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এখন নতুন করে গণপরিষদ গঠন ছাড়া এই সংবিধান পরিবর্তন করা আইনসম্মত নয় (ডেকান হেরাল্ড, ৬.০৮.১৯)। ২০১৮ সালের এপ্রিলের একটি রায়ে সুপ্রিম কোর্টও বলেছে ৩৭০ ধারা কোনও মতেই 'অস্থায়ী' নয়।

৩৫-এ ধারা অনুযায়ী কাশ্মীরের স্থায়ী বাসিন্দা ছাড়া বাকিদের সে রাজ্যে জমি কেনা, রাজ্য সরকারি চাকরি পাওয়া নিষেধ। বিজেপি সরকার বলেছে, এই ধারা রদ করেই ভারতের বাকি অংশের সাথে কাশ্মীরকে তারা মিলিয়ে দিয়েছে। অথচ এমন নিয়ন্ত্রণ ভারতের বহু রাজ্যে এবং আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে আছে। প্রান্তিক এলাকার বাসিন্দা কিংবা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষকে আশ্বস্ত করতে ও তাদের রক্ষা করতেই এই ধরনের আইনি অধিকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সর্বদাই স্বীকৃত। বিজেপি বলছে কাশ্মীরের মেয়েরা বাইরের কাউকে বিয়ে করলে ৩৫-এ ধারার জন্য সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। তারা এই অধিকার কাশ্মীরী মেয়েদের কাছে ফিরিয়ে দিল। অথচ ২০০২ সালেই জম্মু ও কাশ্মীর হাইকোর্ট একটি মামলার রায়ে বলেছে, ৩৫-এ ধারা কাশ্মীরী মহিলাদের পিতা-মাতার সম্পত্তির স্বাভাবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে না (ইন্ডিয়া টুডে, ৬.০৮.১৯)। তাহলে বিজেপি কাশ্মীরী মেয়েদের 'মুক্তিদাতা', এই দাবি আদৌ ধোপে টেঁকে কি?

কাশ্মীরের মানুষের আহত আবেগকে ভাষায় ব্যক্ত করে প্রাক্তন এয়ার ভাইস মার্শাল কপিল কাক বলেছেন, 'কাশ্মীর ভারতকে ত্যাগ করেনি, কার্যত ভারতই কাশ্মীরকে ত্যাগ করল'(টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ১১ আগস্ট, ২০১৯)। কাশ্মীরে আজ এত সেনা, অথচ বাস্তবে সাধারণ মানুষের জীবনে কোনও নিরাপত্তা নেই। তিন মাস হয়ে গেল কাশ্মীরে বিরোধী দলের নেতারা বন্দি, সরকারের ন্যূনতম সমালোচনা করতে পারেন এমন সম্ভাব্য ব্যক্তিরা তো বটেই এমনকী বহু নাবালকও জেলে বন্দি। সংবাদমাধ্যমও কার্যত স্তব্ধ, কারণ সরকারের সমালোচনা হলে নাকি সন্ত্রাসবাদীদের সুবিধা হবে! সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলেই সাংবাদিকদের জুটছে সেনাবাহিনীর মার। ১ নভেম্বর রাজধানী শ্রীনগরে মহিলা সাংবাদিকরা পর্যন্ত সেনাবাহিনীর জওয়ানদের হাতে প্রহৃত এবং মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন। বন্ধ ইন্টারনেট, প্রিপেড মোবাইল— তাতে নাকি সন্ত্রাসবাদীরা কোণঠাসা হয়ে যাবে! কিন্তু এর বিপরীতে দেখা যাচ্ছে কোণঠাসা হয়ে আছেন সাধারণ মানুষই। পুলিশ-মিলিটারি-আধাসামরিক বাহিনীর অস্ত্রের জোরে মানুষকে আটক রেখে উপর উপর সব শান্তিপূর্ণ দেখানোর চেষ্টা মানুষের ধূমায়িত ক্ষোভকে বাড়িয়ে তুলেছে।

সাংবাদিকরা যতটুকু কাশ্মীরে পৌঁছতে পেরেছেন, তাতেই দেখা যাচ্ছে সন্ত্রাসবাদীদের হাতে নিরীহ শ্রমিকদের এই হত্যাকাণ্ডকে অতিথিবৎসল এবং শান্তিপ্রিয় কাশ্মীরী জনগণ তাঁদের 'কাশ্মীরীয়তে'র উপর আঘাত হিসাবেই দেখছেন। ভারত সরকার এই বার্তাটি পড়তে পারলে উপকার হত। তা হলে ভুয়ো সংঘর্ষে হত্যার বিচারের ন্যায্য দাবিটিকে সরকার মান্যতা দিত। রাষ্ট্রীয় বাহিনীর দ্বারা নির্বিচারে তুলে নিয়ে যাওয়ার পর নিখোঁজ কয়েক শত মানুষের যথাযথ খবর পরিবারকে দেওয়ার জন্য তারা উদ্যোগী হত। বোঝার চেষ্টা করত কেবলমাত্র নির্মম প্রহার আর ছররা বুলেটই যে 'গণতান্ত্রিক' রাষ্ট্রের প্রতীক নয়, এ কথা কাশ্মীরের মানুষকে বোঝানোটা আজ কতখানি দরকার। এই পরিস্থিতিতে ভারতের অন্যান্য অংশের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষকে কাশ্মীরের প্রশ্নটিকে অত্যন্ত সহানুভূতির সাথে দেখতে হবে। একদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের দীর্ঘদিন অনুসৃত দমনমূলক-প্রবঞ্চনামূলক কাশ্মীর নীতির বিরোধিতায় যেমন গণআন্দোলন গড়ে তোলা দরকার, একই সাথে কাশ্মীরের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক দাবি নিয়ে আন্দোলনের সামান্য সম্ভাবনাকেও গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। সারা ভারতের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দাবির সাথে তাকেও যুক্ত করা প্রয়োজন। কাশ্মীরের চাষি-মজুর-মধ্যবিত্ত মানুষের ন্যায্য দাবি নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার মাধ্যমেই তাঁদের আস্থা ফেরানো এবং সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী শক্তিগুলির প্রভাব থেকে তাঁদের মুক্ত করা সম্ভব। তাঁদের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরকার যখন এ কাজ করবে না তখন যথার্থ বাম-গণতান্ত্রিক শক্তি এবং গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষকেই আজ এ দাবি তুলতে হবে।

এনএমসি বাতিলের দাবি কনভেনশনে

উপস্থিত চিকিৎসক ও মেডিকেল ছাত্র প্রতিনিধিরা

একের পাতার পর

সাধারণ সম্পাদক), ডাঃ কাফিল খান (উত্তরপ্রদেশ বিআরডি মেডিকেল কলেজের লেকচারার), ডাঃ বিজ্ঞান বেরা (মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সর্বভারতীয় সম্পাদক)। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের সভাপতি অধ্যাপক ডাঃ প্রদীপ ব্যানার্জী, সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস এবং কোষাধ্যক্ষ ডাঃ স্বপন বিশ্বাস।

এন এম সি বিরোধী আন্দোলন পরিচালনার জন্য এই কনভেনশন থেকে গঠিত হয় ন্যাশনাল অ্যাকশন ফোরাম এগেনস্ট ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন (এন এ এফ-এন এম সি)। সভাপতি নির্বাচিত হন তেলেঙ্গানার জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের নেতা ডাঃ সাত্তার খান, সম্পাদক হয়েছেন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের কলকাতা জেলা সম্পাদক ডাঃ বিপ্লব চন্দ্র। এই কালা আইনের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে দীর্ঘস্থায়ী শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানান নবনির্বাচিত সম্পাদক ডাঃ বিপ্লব চন্দ্র।

৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ সারা দেশজুড়ে এনএমসি বিরোধী দিবস পালন এবং মার্চ মাসের মাঝামাঝি দেশ জুড়ে সংগৃহীত স্বাক্ষর সংবলিত স্মারকলিপি নিয়ে পার্লামেন্ট অভিযানের ডাক দেয় নবনির্বাচিত কমিটি।

সংবাদপত্রের পাতা থেকে

রামের মন্দির নিয়ে সাধুসমাজে খেয়োখেয়ি

এক জনের নাম শুনলেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠছেন অন্য জন। নিন্দে-মন্দ তো আছেই, ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’কে তাক করে বাদ যাচ্ছে না গালিগালাজও। এমনকি হত্যার চক্রান্তের অভিযোগও উঠছে! রাম মন্দির নির্মাণের দাবিতে এত দিন কোমর বেঁধে লড়াইয়ের পরে এ বার তার চাবির দখল নিয়ে অযোধ্যার সাধুদের মধ্যে যুদ্ধ ক্রমশ তিক্ত হচ্ছে।

তপস্বী ছাউনির মহন্ত পরমহংস দাসের অভিযোগ, রামমন্দির তৈরির দাবিতে তিনি জেলে গিয়েছেন, আমরণ অনশনেও বসেছেন। কিন্তু এখন মন্দিরের জন্য সরকারের গড়া অছি পরিষদে (ট্রাস্ট) তাঁর সামিল হওয়া রুখতে তাঁকে হত্যার চেষ্টা করেছে রাম মন্দির ন্যাস। পরমহংস দাসের কথায়, ‘আমাকে হত্যার জন্যই লোক পাঠিয়েছিলেন ন্যাসের প্রধান নিত্যগোপাল দাস। তারা এসে ভাঙচুর চালিয়েছে। বাদ রাখেনি গালিগালাজও।’ ন্যাসের সদস্য রামবিলাস বেদান্তী পরিষদের মাথায় বসতে চান বলেও অভিযোগ তুলেছেন তিনি।

যে নির্মোহী আখড়া ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত বিতর্কিত চত্বর পুজা চালিয়ে গিয়েছে, তাদেরও পরিষদে সামিল করার বিরোধী ন্যাস। আবার নির্মোহী আখড়ার মহন্ত দীনেন্দ্র দাসদের পাল্টা ইঙ্গিত, ন্যাসের চোখ মন্দিরের তহবিলে। এর আগে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বিরুদ্ধে যে ওই তহবিলের টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ উঠেছিল, এখন তা-ও মনে করিয়ে দিচ্ছেন তাঁরা। করসেবকদের কেউ চান ট্রাস্টে থাকুন প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। আবার কেউ বলছেন, ট্রাস্টে থাকুন শুধু সাধুসন্তরা।

স্থানীয় সূত্রে শোনা যাচ্ছে, সাধুরা জানেন, বিতর্কিত ২.৭৭ একরের বাইরে আরও ৬৭ একর জমি রামমন্দিরের হাতে আসার সম্ভাবনা। তার উপরে এত প্রচারের আলোয় থাকা মন্দির। দেশে-বিদেশে এত ভক্ত। সব মিলিয়ে মন্দিরের কোষাগার দ্রুত ফুলেফেঁপে ওঠার বিপুল সম্ভাবনা।

প্রশ্ন উঠছে, সেই কারণেই কি এক ইঞ্চি জায়গাও ছাড়তে নারাজ কোনও পক্ষ?

(আনন্দবাজার পত্রিকা ঃ ১৭ নভেম্বর ২০১৯)

পরস্পরকে দুষছেন যোগী এবং কেশব

এক জন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। আর এক জন উপ-মুখ্যমন্ত্রী। একে অপরের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনলেন যোগী আদিত্যনাথ এবং কেশবপ্রসাদ মৌর্য। প্রথমে পূর্ত দফতরের কাজ এবং রাস্তা দেখভাল নিয়ে প্রশ্ন তোলেন আদিত্যনাথ। এই দফতরটি রয়েছে কেশবের হাতে। পরে আদিত্যনাথের হাতে থাকা লখনউ ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (এলডিএ)-র কাজে দুর্নীতি চলছে, এই অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেন কেশব। মুখ্যমন্ত্রী এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রীর এই দোষারোপের খেলাই এখন লখনউয়ের রাজনীতিতে সব চেয়ে আলোচিত বিষয়।

(আনন্দবাজার পত্রিকা ঃ ১৭ নভেম্বর ২০১৯)

শিক্ষার ব্যবসায়ীকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণের নীল নক্সা
‘জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১৯’ এবং মেডিকেল শিক্ষায়
সর্বনাশা এনএমসি বাতিলের দাবিতে

এ আই ডি এস ও-র

নবম সর্বভারতীয় সম্মেলন

২৬-২৯ নভেম্বর, হায়দরাবাদ

প্রকাশ্য সমাবেশ ঃ ২৬ নভেম্বর

পাম্বলু বীরশালিঙ্গম মঞ্চ (ধরনা চক),
উদ্বোধক ঃ অধ্যাপক পি এল বিশ্বেশ্বর রাও
বিশেষ অতিথি ঃ অধ্যাপক রবিবর্মা কুমার, কান্নন গোপীনাথন
বক্তা ঃ কমরেড কে শ্রীধর, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)
কমরেড অশোক মিশ্র, সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক
কমরেড কমল সাঁই, সর্বভারতীয় সভাপতি

প্রতিনিধি অধিবেশন ঃ ২৭-২৯ নভেম্বর

বিদ্যাসাগর মঞ্চ (এগজিবিশন গ্রাউন্ড)
প্রধান অতিথি ঃ কমরেড প্রভাস ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

শিক্ষা বিষয়ক সেমিনার ঃ ২৭ নভেম্বর

আলোচক ঃ অধ্যাপক রাজন গুরুকুল, অধ্যাপক এস ইরফান হাবিব, অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি মুখার্জী, অধ্যাপক রাম পুনিয়ানি, অধ্যাপক আর মনিভাশান, জহিরুদ্দিন আলি খান প্রমুখ।

উত্তরাখণ্ডে গাড়োয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ে ফি বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনে ডিএসও

বিজেপি পরিচালিত উত্তরাখণ্ডে গাড়োয়াল ইউনিভার্সিটি ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার ফি ক্রমশ বাড়াচ্ছে। ফলে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। একই সাথে রাজ্যের আয়ুর্বেদিক কলেজগুলিতে হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করে সরকার ১৭০ শতাংশ ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্তে অনড় হয়ে রয়েছে। এর প্রতিবাদে ছাত্রদের আন্দোলন চলছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যায্য ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং জে এন ইউ ও আয়ুর্বেদ কলেজের ফি বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনের সমর্থনে এআইডিএসও শ্রীনগর-গাড়োয়াল ইউনিটের পক্ষ থেকে ১৫ নভেম্বর এইচএনবি সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

কটকে শ্রমিক সম্মেলন

১৭ নভেম্বর এআইইউটিইউসি-র উদ্যোগে
দ্বিতীয় কটক জেলা সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের একাংশ

দেশে অপরাধ বেড়ে চলেছে তথ্য আড়ালে ব্যস্ত বিজেপি সরকার

ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস বুরো (এন সি আর বি)-র ২০১৭ সালের বার্ষিক রিপোর্টটি প্রকাশিত হল ২০১৯ সালের ২১ অক্টোবর। সরকারি এই সংস্থার কাজ দেশের সমাজজীবনে সংঘটিত অপরাধগুলির সামগ্রিক এবং রাজ্যভিত্তিক পরিসংখ্যান তুলে ধরা। প্রতিদিন নানা ধরনের অপরাধের ঘটনা বৈদ্যুতিন মাধ্যম এবং খবরের কাগজে বের হয়। কিন্তু এই অপরাধগুলি সমাজজীবনে কতখানি ছড়িয়ে আছে, সেগুলি বাড়ছে না কমছে— তা তুলে ধরার কথা এই রিপোর্টে। ২০১৭-র আগে বিভিন্ন বার্ষিক রিপোর্ট সমাজ-পরিস্থিতির ভয়াবহ ছবিটা কিছুটা হলেও তুলে ধরেছিল।

২০১৭ সালের বার্ষিক রিপোর্টটি প্রকাশ হল ২০১৯-এর শেষে, এন সি আর বি-র ৭০ বছরের ইতিহাসে যা কখনও ঘটেনি। দেরিতে প্রকাশ হওয়া সত্ত্বেও রিপোর্টটি অসম্পূর্ণ। গণপ্রহারে মৃত্যু, জাতপাতের সংঘর্ষের ফলে মৃত্যু, খাপ পঞ্চায়েতের নিদানে খুন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে গণধর্ষণ, গোরক্ষার নামে হত্যা, সাংবাদিকদের উপর হামলা সহ পঁচিশটি অপরাধ সম্পর্কে কোনও তথ্য রিপোর্টে প্রকাশিত হয়নি। কেন প্রকাশ করা হল না? ২০১৫ সালে মহম্মদ আখলাক ও পেহলু খানের গণপিটুনিতে মৃত্যুর ঘটনার পরে এই ধরনের অপরাধের বিষয়টি রিপোর্টে অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু ২০১৬ সালের রিপোর্টেও এই বিষয়ে কোনও তথ্য প্রকাশিত হয়নি। এরপর সেই সময়ের এনসিআরবি-র ডিরেক্টর ঈশ কুমারের অধীনে আলাদাভাবে গণপিটুনি ও ধর্মীয় কারণে খুনের ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তা সত্ত্বেও ২০১৭ সালের রিপোর্টে এই বিষয়ে কোনও তথ্য পাওয়া গেল না। খণ্ডিত এই রিপোর্ট দেখাচ্ছে আগের বছরের তুলনায় অপরাধের নথিভুক্তির মাত্রা ৩.৬ শতাংশ বেড়েছে। অপহরণের মাত্রা বেড়েছে ৯ শতাংশ। সমস্ত অপরাধের ক্ষেত্রেই শীর্ষে উত্তরপ্রদেশ, দ্বিতীয় বিহার। মহিলাদের উপর অত্যাচারের ক্ষেত্রেও উত্তরপ্রদেশ শীর্ষে। দ্বিতীয় স্থানে মহারাষ্ট্র। দাঙ্গার ঘটনার ক্ষেত্রে প্রথম বিহার, তারপরে উত্তরপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্র।

পশ্চিমবঙ্গও পিছিয়ে নেই। হিংসার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ তৃতীয় স্থানে এবং মহিলাদের উপর অত্যাচারের ক্ষেত্রেও তৃতীয় স্থানে। কিন্তু ধর্ষণের চেষ্টার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ শীর্ষ স্থানে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় থেকে যে পশ্চিমবঙ্গ আন্দোলন, শিক্ষাদীক্ষা ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে গোটা ভারতবর্ষকে পথ দেখাত, আজ লজ্জাজনক ভাবে জঘন্য অপরাধের ঘটনার সংখ্যায় তার নাম উপরে উঠে আসছে।

সামগ্রিক ভাবে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে এই ধরনের অপরাধচিত্র ভয়াবহ। এমনিতেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপে বিজেপি সরকার চূড়ান্ত ভাবে সমালোচিত। সামাজিক ক্ষেত্রেও দেশের এবং তাদের শাসিত রাজ্যগুলির এই ভয়াবহ চিত্র জনসমক্ষে প্রকাশ পেলে তা বিজেপির 'রামরাজত্বে'র পর্দা ফাঁস করে দেবে, সে জন্যই কি নির্বাচনের প্রাকমুহূর্তে এই রিপোর্টের প্রকাশ আটকে দেওয়া হয়েছিল? চরম অর্থনৈতিক সঙ্কটে, বেকারি, ছাঁটাই, মূল্যবৃদ্ধির কোপে মানুষ বিপর্যস্ত। কৃষকরা আত্মহত্যা করছেন, শ্রমিকরা অর্থনৈতিক খাঁড়ার মুখে দাঁড়িয়ে, ব্যাঙ্কে সুদের হার কমছে শুধু নয়, ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আমানতের সুরক্ষা পর্যন্ত থাকছে না। এই চূড়ান্ত অস্থির পরিস্থিতির মধ্যে 'জাতীয় নাগরিক পঞ্জি'-র নামে 'বিদেশি' তকমা লাগিয়ে দেওয়ার হুঙ্কারে আতঙ্কগ্রস্ত মানুষ। এমনিতেই সংখ্যাগুরু ধর্মের জিগির তুলে ধর্মীয় সংখ্যালঘু, নিম্নবর্ণ, দলিতদের উপর আক্রমণের ঘটনা ঘটেই চলেছে। বিস্ফোরক এই পরিস্থিতিতে এনসিআরবি-র রিপোর্টে যদি ভয়াবহ সামাজিক চিত্রটা প্রকাশ পায় তা হলে মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারে। তাই তথ্য চাপা দেওয়ার এই হীন প্রয়াস।

বলিভিয়ায় ক্যু-এর পিছনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, রুখে দাঁড়াচ্ছে মানুষ

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতে বলিভিয়ার দক্ষিণপন্থী ধনকুবের গোষ্ঠী সেনা ও পুলিশবাহিনীর সাহায্য নিয়ে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে বলিভিয়ায় চতুর্থবারের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ইভো মোরালেসকে পদত্যাগে বাধ্য করল। ১০ নভেম্বর মোরালেস মেক্সিকোতে রাজনৈতিক আশ্রয় নেন। প্রতিবাদে উত্তপ্ত বলিভিয়ার মানুষ প্রেসিডেন্টের সমর্থনে রাস্তায় নেমেছে। তাদের উপর ব্যাপক হামলা চালাচ্ছে পুলিশ ও সেনা। এই আক্রমণে আহত হয়েছেন অনেকে। মৃত্যুও হয়েছে কয়েকজন বিক্ষোভকারীর।

প্রেসিডেন্ট মোরালেসের সমর্থনে রাজধানী লা পাজে জনজোয়ার

দক্ষিণ আমেরিকার দেশ বলিভিয়ায় জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ জনজাতি গোষ্ঠীভুক্ত। দরিদ্র এই মানুষগুলি দেশের অল্পসংখ্যক ধনী, দক্ষিণপন্থী শ্বেতাঙ্গদের প্রবল শোষণ-নিপীড়ন ও ঘৃণার শিকার। মোরালেসই বলিভিয়ায় জনজাতি গোষ্ঠী থেকে আসা প্রথম প্রেসিডেন্ট। ২০০৬-এর জানুয়ারিতে প্রথমবার নির্বাচিত হয়ে সরকার গড়ে তাঁর বামপন্থী দল 'মুভমেন্ট ফর সোসালিজম' (এমএএস), যার নামের অর্থ— সমাজতন্ত্রের পথে যাত্রা। পর পর তিনবার প্রেসিডেন্ট হন মোরালেস। গত ২০ অক্টোবরের নির্বাচনে দেশের মানুষ চতুর্থবারের জন্য তাঁকেই আবারও প্রেসিডেন্ট হিসাবে বেছে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে কোনও প্রমাণ ছাড়াই ভোটে কারচুপি হয়েছে বলে প্রচারে নেমে পড়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার পেটোয়া 'অর্গানাইজেশন অফ আমেরিকান স্টেটস' (ওএএস)। পাশে দাঁড়ায় পুঁজিপতিদের মদতপুষ্ট বলিভিয়ার পুলিশ ও সেনাবাহিনী। দক্ষিণপন্থীরা মোরালেসের সমর্থক নেতাদের উপর হামলা শুরু করে, দেশ জুড়ে তাদের বাড়িঘর ও অফিসগুলিতে আগুন লাগায়। নেতৃত্ব দেন বলিভিয়ার অতি-দক্ষিণপন্থী নেতা ফার্নান্দো ক্যামাচো এবং ধনকুবের গোষ্ঠীর স্বার্থবাহী প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট কার্লোস মেসা। সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী পরিচালিত সংবাদমাধ্যমও এই মিথ্যাপ্রচার দুনিয়া জুড়ে ছড়াতে শুরু করে। দেশে শান্তি ফেরানোর আশায় মোরালেস পুনর্নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু তাতে নিরস্ত হয়নি ধনকুবেরদের স্বার্থবাহী বলিভিয়ার দক্ষিণপন্থীরা। পুলিশ-মিলিটারির সাহায্য নিয়ে তারা দেশ জুড়ে অশান্তির পরিবেশ তৈরি করে। অবশেষে পদত্যাগে বাধ্য হন মোরালেস। দেশ ছেড়ে মেক্সিকোয় চলে যেতে হয় তাঁকে।

কেন মোরালেস মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও দেশের বৃহৎ পুঁজিপতিদের চক্ষুশূল? প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর গত ১৩ বছরে মোরালেস বেশ কিছু কল্যাণমূলক কর্মসূচি নেওয়ার মাধ্যমে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমানের খানিকটা উন্নতি ঘটিয়েছেন। বলিভিয়া খনিজ সম্পদ লিথিয়ামে সমৃদ্ধ। ব্যাটারি ও ইলেকট্রিকচালিত গাড়িতে লিথিয়াম ব্যবহার করা হয়। ক্ষমতায় বসার পর মোরালেস লিথিয়ামকে কেন্দ্র করে বহুজাতিক কোম্পানির মুনাফা লোটা অংশত রুখে দেন। প্রাকৃতিক সম্পদ ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করেন। দক্ষিণ আমেরিকার আরও কয়েকটি দেশ যেমন ভেনেজুয়েলা, ইকুয়েডর, কিউবা ও নিকারাগুয়ার সঙ্গে একযোগে ল্যাটিন আমেরিকান সংগঠন গড়ে মার্কিন ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের দাপটের বিরুদ্ধে মাথা তোলার চেষ্টা চালিয়েছেন মোরালেস। গত কয়েক বছরে বলিভিয়ায় শিক্ষিতের হার একশো শতাংশে পৌঁছেছে, সকলের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে, গড় আয়ু বেড়েছে এবং দেশের সংসদে মহিলা প্রতিনিধিত্ব বিপুল পরিমাণে বেড়েছে।

প্রেসিডেন্ট মোরালেসের এইসব জনকল্যাণমূলক নীতিতে পিছিয়ে পড়া জনজাতির মানুষ সহ দেশের খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষের উত্থান, পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া কারবারিদের মুনাফায় টান পড়ার কারণে বলিভিয়ার বড় পুঁজিপতির দল ও বাইরের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ উভয়েরই চক্ষুশূল হয়ে ওঠেন মোরালেস। নির্বাচনের আগেই বলিভিয়ার দক্ষিণপন্থী শ্বেতাঙ্গ ধনকুবের গোষ্ঠী সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে যে মোরালেসকে আর ক্ষমতায় থাকতে দেওয়া হবে না। পাশে দাঁড়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও যখন মোরালেসকে হারানো গেল না, তখন ২০ তারিখে নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরে পরেই দেশের পূর্ব দিকে নিজেদের প্রভাবাধীন এলাকাগুলি থেকে বেরিয়ে এসে তাণ্ডব শুরু করে দক্ষিণপন্থী ঝটিকা বাহিনী। অভ্যুত্থানের নেতা ফার্নান্দো ক্যামাচোর নেতৃত্বে রাজধানী লা পাজের দিকে এগোতে থাকে তারা। রাস্তায় সাধারণ মানুষের ওপর ব্যাপক মারধর চলে, ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। প্রেসিডেন্টের বোনের বাড়িও এদের তাণ্ডবের শিকার হয়।

কয়েকদিন চূড়ান্ত নৈরাজ্যের পর ১২ নভেম্বর দক্ষিণপন্থী সাংসদ জেনাইন অ্যানেজ বাইবেল হাতে নিয়ে নিজেকে অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন। এই সাংসদ ধর্মীয় গোঁড়ামি ও জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষের প্রতি ঘৃণার জন্য বহু আগে থেকেই নিন্দিত। সম্প্রতি স্বঘোষিত এই প্রেসিডেন্টের ২০১৩ সালে করা কিছু 'টুইট' ফাঁস হয়ে গেছে, সেইসব লেখার ছত্রে ছত্রে ধরা পড়েছে দেশের দরিদ্র জনজাতি গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের প্রতি তাঁর তীব্র ঘৃণার কথা।

এই অন্যায় মানতে রাজি নন বলিভিয়ার সাধারণ মানুষ। প্রতিবাদে বলিভিয়ার রাস্তায় রাস্তায় প্রতিদিন এখন জনজোয়ার। চলছে পুলিশ ও মিলিটারির নির্মম হামলা। টিয়ার গ্যাস, লাঠি, গুলির সামনে বুক চিতিয়ে লড়ছেন বলিভিয়ার মানুষ। এ পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে বেশ কয়েকজনের, আহত শতাধিক। বিক্ষোভকারীদের গ্রেপ্তার করছে পুলিশ। দেশের শ্রমিক ও কৃষকদের সংগঠনগুলিও মোরালেসের প্রতি তাদের সমর্থন জ্ঞাপন করে পথে নেমেছে।

শুধু বলিভিয়া নয়, গোটা বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মানুষ এই জঘন্য অভ্যুত্থানের নিন্দায় সরব হয়েছে। অভ্যুত্থানের নিন্দা করে প্রেসিডেন্ট মোরালেসের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন কিউবার প্রেসিডেন্ট মিগুয়েল দিয়াজ-কানেল, ব্রাজিলের জেল থেকে সদ্য মুক্তি পাওয়া নেতা লুলা ডি সিলভা, আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট, ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো, কলম্বিয়ার রাজনৈতিক নেতা গুস্তাভো পেত্রো সহ অন্যান্য বহু দেশের বামপন্থী রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীরা।

বলিভিয়ার ঘটনা দেখিয়ে দিল, যতদিন লুটেরা সাম্রাজ্যবাদ টিকে থাকবে ততদিন পুঁজিপতিদের মুনাফা লুটের স্বার্থে এভাবেই দেশে দেশে তারা গণতন্ত্রকে পদদলিত করবে। এই ঘৃণ্য অভ্যুত্থানের তীব্র প্রতিবাদ করার পাশাপাশি বিশ্ব জুড়ে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে তাই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় সোচ্চার হতে হবে।

পাঠকের মতামত

দেশবন্ধুর মতো মহৎ চরিত্র চাই

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ নামটি শুনলেই অন্তরের অন্তস্তল থেকে এক গভীর শ্রদ্ধা উঠে আসে। তাঁর হৃদয়ের গভীরতার টানে আকৃষ্ট হয়েছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। মেনে নিয়েছিলেন তাঁকে নেতা হিসেবে। তাঁর মৃত্যুর পর মান্দালয় জেলে বসে দেশবন্ধুর জীবনচরিত লেখক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে নেতাজি লিখেছিলেন, '...যাহাদিগকে আমরা সাধারণত ঘৃণায় ঠেলিয়া ফেলি, তিনি তাহাদিগকে বুকে টানিয়া লইতেন।...যাহারা তাঁহার পাণ্ডিত্যের নিকট মাথা নত করেন নাই, অসাধারণ বাগ্মিতায় বশীভূত হন নাই, বিক্রমের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন নাই, অলৌকিক ত্যাগে মুগ্ধ হন নাই, তাহারা পর্যন্ত এই বিশাল হৃদয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ...'

মাতৃভূমির মুক্তির জন্য তিনি নিজেকে নিঃস্ব করে দান করেছিলেন। নিজের বসতবাড়ি পর্যন্ত নিজের জন্য না রেখে তিনি জাতির উদ্দেশে দান করে যান। নিজের জন্য কোনও কিছু না রেখে তিনি যে সবকিছু দান করে নিঃস্ব হয়েছিলেন, সেই জন্য সে যুগে চারিদিকে শুধু একটাই কথা ধ্বনিত হত— চিত্তরঞ্জন সব দান করেছেন। একটি ঘটনা উল্লেখ করি।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের দুই পণ্ডিত তারাপ্রসন্ন কাব্যতীর্থ এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন। কাব্যতীর্থ মশায় বললেন, দেশবন্ধু যথাসর্বস্ব দান করে ফেলেছেন, ওর পুঁথিগুলো পেলে সাহিত্য পরিষদের বড় উপকার হয়। হরপ্রসাদবাবু বললেন, তা বুঝলাম কিন্তু ভদ্রলোক হাজার হাজার টাকা খরচ করে এসব বই সংগ্রহ করেছেন। তার বড় শখের এই পুঁথি। মানুষ সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারেন কিন্তু শখের জিনিস কি কেউ ত্যাগ করতে পারেন? কাব্যতীর্থ মশায় তবুও বললেন, একবার তার কাছে গিয়ে চেষ্টা করে দেখা যাক না। কাব্যতীর্থ মশায়ের সাথে একমত না হয়েও শাস্ত্রী মশায় এবং তিনি চিত্তরঞ্জনের বাড়ি গেলেন। চিত্তরঞ্জন কী একটা কাজ করছিলেন। তখন ওরা বললেন, সাহিত্য পরিষদ থেকে এসেছি আমরা। একটু হাসলেন চিত্তরঞ্জন। বললেন, কিন্তু সাহিত্য পরিষদের কাজে লাগে এমন কিছুই তো আর দান করার মতো আমার অবশিষ্ট নেই। শাস্ত্রী মশায় তখন একটু দ্বিধা করে বললেন, আপনার ওই বইগুলো যদি পরিষদকে দান করেন তবে পরিষদের বড় উপকার হয়। খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠলেন চিত্তরঞ্জন। বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ— আপনি ঠিক কথাই তো মনে করিয়ে দিয়েছেন, সেগুলো তো আছেই। এই বলে চিত্তরঞ্জন বইয়ের আলমারিগুলোর সব চাবি পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশায়ের হাতে তুলে দিলেন এবং বললেন, যা যা দরকার সব নিয়ে যান।

সত্যি নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিলেন তিনি দেশমাতৃকার চরণে। দেশবন্ধু পরম ঈশ্বর বিশ্বাসী ধার্মিক হয়েও আধ্যাত্মিক মুক্তি সাধনায় নিজেকে নিযুক্ত করেননি। মাতৃভূমির রাজনৈতিক মুক্তির জন্য সমগ্র জীবনব্যাপী বীর সৈনিকের মতোই তিনি যুদ্ধকরে গেছেন। আগলে রেখেছিলেন সে যুগের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রাণ উৎসর্গ করতে আসা তরুণ-যুবকদের।

দেশবন্ধু সব সময় চেষ্টা করতেন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যেন পারস্পরিক প্রীতি-ভালবাসা জাগরিত হয়। তিনি হিন্দু ধর্মকে এত ভালোবাসতেন যে তার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন অথচ তাঁর মধ্যে গোঁড়ামি আদৌ ছিল না। সেই জন্য তিনি ইসলামকেও ভালবাসতে পারতেন। নেতাজি বলেছিলেন, 'আমি জিজ্ঞাসা করি কয়জন হিন্দু নায়ক বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন তাহারা মুসলিমকে আদৌ ঘৃণা করেন না? কয়জন মুসলিম জননায়ক বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন তাহারা হিন্দুকে ঘৃণা করেন না?...কিন্তু তাঁহার বুকের মধ্যে সকল ধর্মের লোকের স্থান ছিল।'

দেশবন্ধুর ১৫০তম জন্মবর্ষে দাঁড়িয়ে দেশের বর্তমান নেতাদের দেখলে শুধু এই কথাই আমাদের মনে হয়, যারা নিজের সম্পত্তি বৃদ্ধির জন্য মানুষ ঠকিয়ে রাজনীতি করেন তারা মানুষের কোন মঙ্গল আনতে পারেন? মানুষের জন্য কী ভাল করতে পারেন? সাধারণ মানুষ আজ এইসব ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি বীতশ্রদ্ধ। আজ প্রয়োজন দেশবন্ধুর মতো বড় চরিত্র সৃষ্টির রাজনীতির চর্চা। কারণ মহৎ চরিত্রের চর্চা ছাড়া মানুষের বড় চরিত্র গড়ে উঠতে পারে না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের হৃদয়ের স্পর্শে সুভাষচন্দ্র 'নেতাজি' হয়েছিলেন। তাঁর প্রতি রইল আমার বিনম্র শ্রদ্ধা।

গৌতম দাস, মালদা

সিলিকোসিসে আক্রান্ত খনি শ্রমিকদের মর্মান্তিক মৃত্যু

সুন্দরবনের এক প্রান্ত গোসাবার একটি গ্রামের পুরুষদের প্রায় সকলেই রুটি-রুজির সন্ধানে গিয়ে বাঘ-কুমীর-হাঙরের পেটে চলে গিয়েছেন। এটা 'বিধবা গ্রাম' হিসাবে পরিচিত। মাছ-কাঁকড়া ধরে সংসার চালানোর চেষ্টায় এখানকার গরিব-গুর্বো মানুষ প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে জলে-জঙ্গলে যান। কেউ ফেরেন, বহুজনের মৃতদেহটুকুও ফেরে না। সে রকমই সিলিকা খনিতে কাজ করতে গিয়ে তেলেঙ্গানার অসংখ্য পরিবার পুরুষ শূন্য।

কাজের জন্য সাধারণ মানুষের হাহাকার রাজ্যে রাজ্যে একইরকম। তেলেঙ্গানার রঙ্গা রেড্ডি জেলার এলকাট্টা, রঙ্গমপল্লি, চৌওলাপল্লি, কামসানিপল্লি এবং পিরলাগুড়া গ্রাম স্থানীয় মানুষের কাছে 'বিধবা পল্লি' হিসাবে পরিচিত। এখানকার বেশিরভাগ মহিলা অকালেই তাঁদের স্বামীদের হারিয়েছেন। সিলিকোসিসে আক্রান্ত হয়ে কার্যত বিনা চিকিৎসায় তাঁদের মৃত্যু ঘটেছে। এঁদের বেশিরভাগই জনজাতি, উপজাতি, পিছিয়ে পড়া বর্গ বা সংখ্যালঘু অংশের।

সিলিকোসিস এক ভয়াবহ অসুখ। বহুদিন লক্ষণগুলি বোঝা না যাওয়ার কারণে সঠিকভাবে রোগ নির্ণয়ও হয় না। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পাওয়ার আগে এখানকার মানুষ এর প্রতিষেধক হিসেবে বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি এক ধরনের চিনির টুকরো ব্যবহার করত। স্থানীয় মানুষ একে 'গুট্টালা বিমারি' বা 'পাহাড় থেকে আসা রোগ' বলে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, এই রোগের লক্ষণগুলি হল— খর্বাকৃতি হয়ে যাওয়া, কাশি, জ্বর, নীলাভ চামড়া ইত্যাদি। সিলিকা ডাস্ট বহুদিন শ্বাসপ্রশ্বাসের সাথে নিতে থাকলে এই সব লক্ষণ দেখা যায়। খনিমালিকরা হঠাৎ খনি বন্ধ করে দেয় যখন দেখে শ্রমিকদের প্রায় সকলেই সিলিকোসিসে আক্রান্ত, তাদের দিয়ে কাজ করানো মুশকিল। যদিও খনি মালিকদের মুখ্য অথবা রিজিওনাল ইনস্পেক্টরের কাছে বাধ্যতামূলকভাবে খনি বন্ধ করার কারণ এবং কতজন অসুস্থ তার সংখ্যা জানিয়ে নোটিশ দেওয়ার কথা। কিন্তু অহরহই তা ভঙ্গ করে মালিকরা।

মান্ধাতার আমলের প্রযুক্তিকে ভর করে সিলিকা ডাস্টের মধ্যে সারাদিন কাজ করতে হয় খনি ও পাথর ভাঙার ইউনিটের শ্রমিকদের। কোয়ার্টজের স্তূপ থেকে পাথর ভাঙার ইউনিট, সেখানে ১০০০ ডিগ্রি সেন্ট্রিগেড তাপমাত্রায় ইট পুড়িয়ে ছোট ছোট টুকরোতে ভেঙে তারপর সম্পূর্ণ গুঁড়ো করে তা আয়তক্ষেত্রাকার ছাউনিতে রাখা হয়। এই ছাউনি প্রায় যেন একটা মৃত্যুফাঁদ। শ্রমিকরা গন্ধহীন সিলিকা গুঁড়ো নিঃশ্বাসের সাথে নিতে থাকে। এর ফলে কাশি এবং হাঁপানি শুরু হয়। এর পরের পরিণতি সকলেরই প্রায় এক। এক হাসপাতাল থেকে আর এক হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ছোটাছুটি। তারপর বিনা চিকিৎসায় বা পর্যাপ্ত চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া।

যে শ্রমিকরা মালিকের লাভ বাড়াতে নিজেদের জীবন বাজি রাখে, তাদের প্রতি ন্যূনতম দায়িত্ব পালন করে না খনি মালিকরা। সরকারও তাদের বাধ্য করার কোনওরকম চেষ্টা করে না। কোনও খনির বেশি সংখ্যক শ্রমিক যখন সিলিকোসিসে আক্রান্ত হয় কিংবা মারা যায়, তখন খনি মালিকরা বলতে থাকে, এই খনি আর লাভের মুখ দেখতে পারছে না। এই অজুহাত দিয়ে শ্রমিক ছাঁটাই শুরু হয়। এমনকি খনি বন্ধ করেও দেওয়া হয়। কারণ এতে মালিকের লাভ। ক্লোজার হলে ন্যায্যত যে পাওনাগুলি শ্রমিকদের পাওয়ার কথা, তা না দিয়ে সামান্য কিছু হাতে ধরিয়ে দিলেই হল। ক্ষতিপূরণও দিতে হয় না। ১৯৪৭-এর ইনডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউটস অ্যাক্ট এবং ১৯৬১-র খনি আইনকে দু'পায়ে মাড়িয়ে খনি মালিকরা শ্রমিকদের ঠকাচ্ছে। সরকারের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। তারা এই মালিকদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। কারণ পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সরকার পুঁজিপতিদেরই স্বার্থরক্ষার প্রতিষ্ঠান।

চিকিৎসকরা অনেক সময় সঠিকভাবে সিলিকোসিসের কারণ নির্ণয় না করতে পেরে অথবা কখনও কর্তৃপক্ষের চাপের মুখে পড়ে সিলিকোসিসে শ্রমিক মৃত্যুর কথা রিপোর্টে সরাসরি লেখেন না। ফলে এই রোগে মৃত্যুতে যে ক্ষতিপূরণ মৃতদের পরিবারের পাওয়ার কথা, তাও তারা পান না। ডিরেক্টরেট জেনারেল অব মাইন সেফটি, ডিরেক্টরেট অব ফ্যাক্টরিজ, ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশন, বিধানসভা, সংসদ, হাইকোর্ট সহ নানা সরকারি দপ্তর এবং খনি কর্তৃপক্ষের দপ্তরে বারবার দরবার করেও পরিবারের সদস্যরা এক পয়সা ক্ষতিপূরণ পাচ্ছেন না।

খনি শ্রমিকদের পরিবারগুলি ধ্বংসের মুখে। খনি মালিকদের শোষণ-বঞ্চনা, চূড়ান্ত অবহেলা এবং সরকারের দায়িত্বহীনতায় বিপন্ন হাজার হাজার মানুষ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যকে ডেপুটেশন, দাবি আদায় ডিএসও-র

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরের পরীক্ষার ফল সঠিক সময়ে প্রকাশ করা, দ্বিতীয় বর্ষের পাস কোর্সের রেজাল্ট অতি দ্রুত প্রকাশ করা এবং সিলেবাস সংক্রান্ত অস্পষ্টতা দূর করা, কোনও সেমেস্টারে ফি বৃদ্ধি না করা প্রভৃতি দাবিতে ১৮ নভেম্বর অল ইন্ডিয়া ডি এস ও কলকাতা জেলার পক্ষ থেকে প্রতিনিধিদল উপাচার্যের কাছে ডেপুটেশন দেয়।

উপাচার্য বলেন, এক সপ্তাহের মধ্যেই পাস কোর্সের রেজাল্ট বের করা হবে। তৃতীয় সেমেস্টারে যে সিলেবাস পরিবর্তন হয়েছে তা আগামী বছর থেকে প্রযোজ্য হবে এবং সেমেস্টার সিস্টেমে বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত ফি-র থেকে যে বেশি ফি বিভিন্ন কলেজে নেওয়া হয়েছে, তা ফেরানোর ব্যবস্থা করা হবে।

আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দিন

'অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করার মধ্যে রয়েছে মনুষ্যত্ব ও আত্মমর্যাদার প্রকাশ'— এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ রচিত বইটি পড়েঅভিভূত হয়েছেন দুর্গাপুরের বেনাচিতির ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী সাতাশি বছরের মানবেন্দ্র মণ্ডল মহাশয়। তিনি চান বইটির সত্য ও সাহসী বক্তব্য আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাক। তিনি নিজে দলের কর্মীদের কাছ থেকে দশটি বই কিনে নেন অন্যদের পড়ানোর জন্য।

তোমাদের কাগজ পড়লেই কিছু করতে ইচ্ছা করে

'আর গণদাবী পড়ব না।' এ কথা শুনেও কি গণদাবীর সাথে যুক্ত বা তা বিক্রি করতে যাওয়া কর্মীরা কেউ উৎসাহিত হতে পারেন? পারেন, যদি দেখা হয় সেই মানুষটির সঙ্গে, যিনি বলেন— 'গণদাবী পড়লে চুপচাপ বসে থাকা যায় না, সমাজের জন্য কিছু করতে ইচ্ছা করে। কিন্তু সংসারের চাপে তা পেরে উঠি না, নিজেকে অপরাধী মনে হয়। তাই ভাবছি আর পড়ব না।' ঘটনাটা শোনা গেল ১৩ নভেম্বরের মিছিলে কলকাতার রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে মেদিনীপুর শহরের এক এস ইউ সি আই (সি) দলের মহিলা কর্মীর মুখে। অবশ্য জানা গেল ভদ্রলোক কাগজটা নিয়মিতই নিচ্ছেন। কথা দিয়েছেন, কিছু না পারেন চলা ফেরার পথে গণদাবীর লেখাগুলি আশেপাশের মানুষকে পড়ে শোনাবেন। এটাই হবে তাঁর 'কাজ'।

নবজাগরণের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর

ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই মহান মানবতাবাদীর জীবন ও সংগ্রাম পাঠকদের কাছে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হচ্ছে।

(১৭)

মাইকেল ও বিদ্যাসাগর

ছাত্রাবস্থা থেকেই দরিদ্র অসহায় নিপীড়িত মানুষের প্রতি বিদ্যাসাগরের অকৃত্রিম দরদবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। স্কুলে পড়ার সময়ে, যখন নিজে বাড়িতে চরকা-কাটা মোটা সুতোর তৈরি পোষাক পরতেন তখন, নিজের বৃত্তির টাকায় গরিব সহপাঠীদের জন্য ভাল পোষাক কিনে দিতেন। নিজে যখন দু'বেলা পেট ভরে খেতে পেতেন না তখনও ওই বৃত্তির টাকায় ক্ষুধার্ত সহপাঠীদের জন্য ভাল টিফিনের ব্যবস্থা করতেন। সহপাঠীরা অসুস্থ হলে তাদের চিকিৎসা-পথ্য এবং প্রয়োজনে তাদের সেবা-শুশ্রূষার জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকতেন। ছোটবেলা থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি যে কত শত রোগীর সেবা করেছেন তার হিসাব নেই। এক দুরন্ত বালক এইভাবে ছোট থেকেই সহৃদয় ও সেবাপরায়ণ যুবকে এবং ক্রমে এক মানবতাবাদী আদর্শের প্রতীকে পরিণত হয়েছেন। ঘটনাক্রমে শেষজীবনে বিদ্যাসাগরের ঋণের পরিমাণ হয়েছিল বিপুল। এই বিপুল ঋণের একটি পয়সাও তাঁর নিজের প্রয়োজনে ছিল না। অন্যকে সাহায্য করতে গিয়েই তিনি ধার করেছিলেন। কিন্তু ঋণের বোঝা মাথায় থাকেলেও, আর্থিক সাহায্য করা দরকার এমন, কাউকে কখনও তিনি বিমুখ করেননি। এরই সূত্রে বেরিয়ে আসে বিদ্যাসাগরের অতুলনীয় এবং অবিস্মরণীয় চরিত্রের আরও নানা দিক।

একথা প্রায় সকলেই জানেন যে, বাংলা কাব্য-সাহিত্যের অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্রষ্টা কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিদেশে গিয়ে যখন অর্থকষ্টে চরম বিপদে পড়েছিলেন তখন একমাত্র বিদ্যাসাগরই গভীর মমতায় তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। মাইকেল ছিলেন অসাধারণ কাব্য-প্রতিভার অধিকারী। তাঁর প্রতিভার বিশিষ্টতাকে সেসময় যথার্থভাবে বুঝেছিলেন বিদ্যাসাগর। বাস্তবে, মাইকেল নিছক প্রতিভাবান কবি ছিলেন না, অদৃষ্ট-নির্ভরতা ছেড়ে ব্যক্তিকে আপন বলে বলীয়ান হয়ে ওঠার পক্ষে এবং নারীর উপর সামন্ততান্ত্রিক অকথ্য নিপীড়নের বিরুদ্ধে নবজাগরণের যে চিন্তা, কাব্যে তাকে শিল্পরূপ দিয়েছেন মাইকেল। এই মাইকেলকে বিদ্যাসাগর চিনেছিলেন। তাই মূল্যবান প্রতিভা হিসাবে তাঁকে যেকোনও বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য বিদ্যাসাগর আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন এবং সেটা যে-ভাবে করেছিলেন তাও অত্যন্ত বিরল এবং স্মরণযোগ্য।

দু'জনে ছিলেন প্রায় দু'জগতের মানুষ। কিন্তু দু'জনেই দু'জনের সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল হয়ে উঠেছিলেন। প্রথম দিকে মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ বিদ্যাসাগরের বিশেষ পছন্দ হয়নি। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর ধারণায় পরিবর্তন আসে এবং এই ছন্দের বিশেষ তাৎপর্য তিনি অনুধাবন করেন। এতে মাইকেল অত্যন্ত খুশি এবং আশ্বস্ত হয়েছিলেন। ১৮৬২ সালে এক বন্ধুকে চিঠিতে তিনি লেখেন, "You will be pleased to hear that the great Vidyasagar is almost a convert to the new poetical creed and is beginning to treat the 'apostle' who has propagated it with great attention, kindness, and almost affection!" এবং ওই বছরই প্রকাশিত তাঁর 'বীরাঙ্গনা' কাব্যটি বিদ্যাসাগরকে উৎসর্গ করেন। সেই উৎসর্গপত্রে রয়েছে বিদ্যাসাগরের প্রতি তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধার পরিচয়। এক বন্ধুকে চিঠিতে তিনি লেখেন,"I have dedicated the work to our good friend the Vidyasagar. He is a splendid fellow! I assure you. I look upon him in many respects as the first man among us. ...His admiration is honest, for he is above flattering any man"

ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য পরিবারকে রেখে ইংল্যান্ডে গিয়ে মাইকেল অর্থকষ্টের সম্মুখীন হন। যাবার আগে তিনি তাঁর সম্পত্তির বিনিময়ে যে টাকা পয়সা পাওয়ার ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন, কিছুদিন পর তা আর পাননি। বহু চেষ্টা করেও দেশের পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে কোনও সাহায্য তিনি পেলেন না। ১৮৬৩ সালে তাঁর পরিবার কোনওক্রমে ইংল্যান্ডে পৌঁছয়। মাইকেল তখন কার্যত অথৈ জলে পড়ে যান। পাই-পয়সা বাঁচাবার জন্য তিনি ইংল্যান্ড ছেড়ে ফ্রান্সে গিয়ে উঠলেন। কিন্তু সেখানে খরচ-খরচা কিছুটা কম হলেও টাকার তো প্রয়োজন। বারবার চিঠি লিখছেন দেশে অথচ কেউ কোনও সাড়া দিচ্ছে না। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, অবিলম্বে তাঁকে দেনার দায়ে ফরাসি সরকারের জেলে যেতে হবে এবং সে অবস্থায় পরিবারকে আশ্রয় নিতে হবে কোনও অনাথাশ্রমে। এই চরম সংকটে অবশেষে

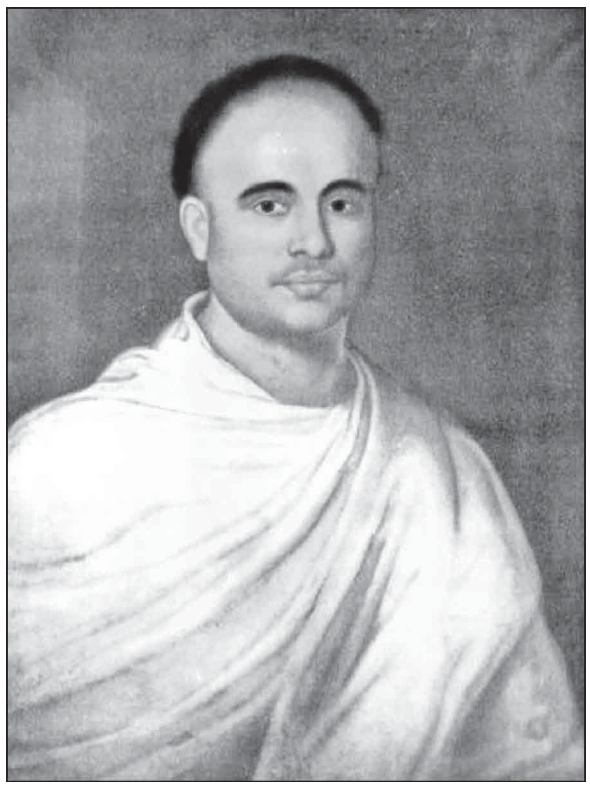

মাইকেল স্মরণ করলেন বিদ্যাসাগরকে। চিঠি লিখলেন তাঁকে। তারপর শুরু হল উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা। তারই মধ্যে একদিন স্ত্রী এসে দাঁড়ালেন মাইকেলের পাশে। চোখ তাঁর ভেজা। মাইকেলকে বললেন, 'ছেলেমেয়েরা মেলায় যেতে চায়, কিন্তু আমার হাতে আছে মাত্র ৩ ফ্রাঁ (ফরাসি মুদ্রা)। ভারতবর্ষের এই লোকগুলো আমাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার কেন করছেন বলো?' মাইকেল তখন আশ্চর্য প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছেন, 'আজকে ডাক আসার দিন। আমি বলছি আজকে একটা খবর পাবই। কারণ, এবার আমি যাঁর কাছে আবেদন জানিয়েছি তাঁর ব্যক্তিত্বে আছে প্রাচীন ঋষির জ্ঞান ও প্রতিভা, ইংরেজের কর্মশক্তি আর বাঙালি মায়ের কোমলতা।' এই কথপোকথনের কিছুক্ষণ পর সত্যিই ডাক এল। ১৫০০ টাকা মাইকেলকে পাঠিয়েছেন বিদ্যাসাগর।

এরপর টাকার প্রয়োজনে মাইকেল দেশে তাঁর সম্পত্তি বন্ধক রাখার কথা ভাবলেন। বিদ্যাসাগর চিঠি লিখে তাঁকে সম্পত্তি বন্ধক রাখতে নিষেধ করলেন এবং আরও ২,৪৯০ ফ্রাঁ পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু এই টাকা জোগাড় করতে গিয়ে বিদ্যাসাগরকে বড় রকমের ঝুঁকি নিতে হয়েছিল। এরপরে বিদ্যাসাগরকে লেখা চিঠিতে দেখা যাচ্ছে, মাইকেল আশঙ্কা প্রকাশ করছেন যে অবিলম্বে যদি তিনি অন্তত ৩০০০ টাকা বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে না পান তাহলে ইংল্যান্ডে ফিরে গিয়ে ব্যারিস্টারি পরীক্ষার লেখাপড়া শুরু করতে পারবেন না। এর কয়েকদিনের মধ্যে মাইকেল আরও একটি চিঠি লেখেন বিদ্যাসাগরকে এবং এই চিঠিতে তিনি ৮০০০ টাকা অত্যন্ত উদগ্রীব ভাষায় চেয়ে পাঠান। সম্ভবত, এই সময়েই বিদ্যাসাগর ৮০০০ টাকা ধার করেছিলেন নিজের দায়িত্বে। মাইকেল ইংল্যান্ডে গিয়ে ব্যারিস্টারি পড়ছেন। মাইকেল যে বিদেশে থাকার বাকি সময়টা নিয়মিতভাবে বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে টাকা পেয়েছেন তাঁর পরবর্তী চিঠিগুলিতে তার উল্লেখ আছে। এভাবে মাইকেল যখনই তাঁর সাহায্য চেয়েছেন, বিদ্যাসাগর ততবার এগিয়ে এসেছেন, কোনওবার তাঁকে বিমুখ করেননি।

ব্যারিস্টারি পাস করার পর মাইকেলের অনুরোধে বিদ্যাসাগর তাঁর জন্য কলকাতার সুকিয়া স্ট্রিটে একটি ভাল বাড়ি ভাড়া করে, তাঁর উপযুক্তভাবে সাজিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু মাইকেল গিয়ে উঠলেন এক দামী হোটেলে। মাস দুয়েক পর হাইকোর্টে কাজে নিযুক্ত হওয়ার ব্যাপারে মাইকেল ফের বিপদে পড়লেন। হাইকোর্ট তাঁর character and good repute সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য সুপারিশ-পত্র পাঠাতে নির্দেশ দিল। তখন তিনি আবার সেই বিদ্যাসাগরকেই স্মরণ করলেন। বিদ্যাসাগর তখন কলকাতায় ছিলেন না। মাইকেল লিখলেন, বিদ্যাসাগর যেন হয় দ্রুত কলকাতায় চলে আসেন অথবা তাঁকে একটি প্রশংসাপত্র পাঠিয়ে দেন। মাত্র দু'মাস আগে মাইকেলের আচরণে বিদ্যাসাগর যে আহত বা রুষ্ট হয়েছিলেন তার কোনও ছাপ তাঁর ব্যবহারে প্রকাশ পেল না। দ্রুত সমস্ত ব্যবস্থা করে এক উপযুক্ত প্রশংসাপত্র তিনি মাইকেলকে পাঠিয়ে দিলেন। এটা পেয়েই মাইকেল হাইকোর্টে কাজ শুরু করতে পেরেছিলেন।

এরপরও বারবার বিপদে একমাত্র বিদ্যাসাগরকেই মাইকেল স্মরণ করেছেন। বিদ্যাসাগর প্রত্যেকবার তাঁকে সাহায্য করেছেন। ১৮৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসে এক দুর্ঘটনার ফলে বিদ্যাসাগর যকৃতে গুরুতর আঘাত পান। তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। মাইকেলের জন্য নিজ দায়িত্বে যে টাকা তিনি ধার করেছিলেন, মাইকেল দেশে ফিরে তা শোধ দেবেন, এমনই কথা ছিল। কিন্তু কোনও টাকা মাইকেল ফেরৎ দিতে পারলেন না। বিদ্যাসাগর তাঁকে চিঠি লিখে টাকা ফেরতের ব্যাপারে জানালেন। সে চিঠি পেয়ে মাইকেল বিচলিত হয়ে উত্তরও দিলেন কিন্তু টাকা দিতে পারলেন না। তখন বিদ্যাসাগর ঋণ শোধ করার জন্য তাঁর প্রিয় সংস্কৃত প্রেসের দুই-তৃতীয়াংশ বিক্রি করে দিতে বাধ্য হলেন। এরপর মাইকেল আবার বিদ্যাসাগরকে লিখছেন, তিনি যেন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের কাছে আদালতে বিচারপতি পদের জন্য তাঁর নাম সুপারিশ করেন। "আমি জানি আপনি ব্রহ্মণ হলেও দুর্বাসার বংশধর নন। আমি যত অন্যায় করি না কেন, আপনার হৃদয়ের স্পর্শলাভে আমি বঞ্চিত হব না। যদিও ঘটনাচক্রে সেসময় বিচারপতির প্রয়োজন না থাকার কারণে সে চাকরি তাঁর হয়নি। ১৮৭০ সালে ব্যারিস্টারি ছেড়ে দিয়ে হাইকোর্টে প্রিভি-কাউন্সিল আপীলের অনুবাদ বিভাগে পরীক্ষকের পদে যোগ দেন মাইকেল। এখানে তাঁর মাসিক আয় ছিল প্রায় দেড় হাজার টাকা। কিন্তু তাতে তাঁর জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসেনি। বরং প্রচুর খরচের কারণে আরও ধারদেনায় ডুবতে থাকলেন তিনি এবং ফের বিদ্যাসাগরের শরণাপন্ন হলেন (১৮৭২ সাল)। বিদ্যাসাগর এই একবার মাত্র আর তাঁকে টাকা দিতে পারলেন না। গভীর দুঃখ পেলেন কিন্তু তিনি নিজেই তখন বিপুল ঋণভারে জর্জরিত। বছর খানেক পর মাইকেল মারা গেলেন। মৃত্যুর পর তাঁর অস্থিরক্ষা এবং স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠার একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়। উদ্যোক্তারা যখন বিদ্যাসাগরের কাছে গেলেন, চোখের জল ফেলে বিদ্যাসাগর তাঁদের ফিরিয়ে দিলেন এই বলে যে, 'প্রাণপণ চেষ্টা করে যার প্রাণ রাখতে পারিনি, তার হাড় রাখার জন্য আমি ব্যস্ত নই।

(চলবে)

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

কমরেড সঞ্জিত বিশ্বাসের জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সঞ্জিত বিশ্বাস দীর্ঘ দিন ধরেই গুরুতর অসুস্থতা নিয়ে কলকাতায় পার্টির টালা সেন্টারে প্রায় শয্যাশায়ী অবস্থায় ছিলেন। শ্বাসকষ্টের রোগে প্রায়শই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়তেন। সর্বদা অক্সিজেন সিলিন্ডার তাঁর ঘরে রাখা ছিল। এই অবস্থায় ১৮ নভেম্বর সকাল সাড়ে আটটায় তাঁর জীবনাবসান ঘটে। বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। এদিন তাঁর মরদেহ পিস ওয়ার্ল্ডে সংরক্ষিত রেখে ১৯ নভেম্বর কেন্দ্রীয় দপ্তরে নিয়ে আসা হয়। সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ এবং পলিটবুরো সদস্যবৃন্দ সহ অন্যান্য নেতারা মাল্যদান করে বিপ্লবী শ্রদ্ধা জানান। তাঁর মৃত্যুতে দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অফিস সহ পার্টির সমস্ত জেলা অফিসে রক্তপতাকা অর্ধনমিত করা হয় এবং কমরেডরা কালো ব্যাজ ধারণ করেন। ৪ ডিসেম্বর কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে বিকেল ৫টায় তাঁর স্মরণ সভা।

কমরেড সঞ্জিত বিশ্বাস লাল সেলাম

পার্শ্বশিক্ষকদের অবস্থান মঞ্চে এসইউসিআই(সি) রাজ্য সম্পাদক

বিধাননগরে পার্শ্বশিক্ষকদের অবস্থান মঞ্চে বক্তব্য রাখছেন রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য

এ রাজ্যে কর্মরত প্রায় ৪৮ হাজার পার্শ্বশিক্ষক সরকারি বঞ্চনার শিকার হয়ে আন্দোলনে নেমেছেন। পূর্ণ শিক্ষকের মর্যাদা এবং সমকাজে সমবেতন কাঠামো চালু করার দাবিতে 'পার্শ্বশিক্ষক ঐক্যমঞ্চ' লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

ঐক্যমঞ্চের যুগ্ম আহ্বায়ক মধুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভগীরথ ঘোষ ক্ষোভের সাথে বলেন, ১৫ বছরেরও বেশি সময় কাজে নিযুক্ত থাকলেও এবং এনসিটিই-র নির্দেশিকা অনুযায়ী পার্শ্বশিক্ষকরা সকলেই প্রয়োজনীয় ডিএলএড যোগ্যতা অর্জন করলেও আজও শিক্ষকের মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না। তা ছাড়া নামমাত্র ভাতা যা দেওয়া হচ্ছে, তা বর্তমান মূল্যসূচকের সাপেক্ষে নিতান্ত সামান্য। ফলে তীব্র আর্থিক কষ্টে গত ৪ বছরে শতাধিক শিক্ষক মারা গিয়েছেন।

ন্যায্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ঐক্যমঞ্চ ১১ নভেম্বর থেকে সল্টলেকে বিকাশ ভবনের পাশে লাগাতার অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে। এই আন্দোলনে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে ১৭ নভেম্বর অবস্থান মঞ্চে যান এস ইউ সি আই (সি) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। তিনি আন্দোলনকারীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, অন্য পেশার সঙ্গে শিক্ষকতার পার্থক্য আছে। শিক্ষাদানের মাধ্যমে ছাত্রদের জীবনে আলো জ্বালান শিক্ষকরা। তাই তাঁদের বলা হয় মানুষ গড়ার কারিগর। স্বাধীনতার এতদিন পরে সেই শিক্ষকদের পথে নামতে হচ্ছে। আবার পথে নামারও অনুমতি দেয়নি সরকার। হাইকোর্টে আবেদন করে আপনারা অবস্থানে বসেছেন, অনশন করছেন। এর আগে আপনাদের উপর লাঠিচার্জ হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, কী রাজ্য, কী কেন্দ্রীয় সরকার— কেউই শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়াতে পারে না বা শিক্ষকদের দাবি মেটাতে পারে না, অথচ উৎসবে দেদার টাকা ঢালতে পারে, পুলিশ-মিলিটারি খাতে বিপুল ব্যয় করতে পারে। কমরেড ভট্টাচার্য এই আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

১৬ নভেম্বর পার্শ্বশিক্ষকদের আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে অবস্থান মঞ্চে যান ছাত্র সংগঠন ডি এস ও এবং যুব সংগঠন ডি ওয়াই ও-র প্রতিনিধিরা। অনশনকারীদের পুষ্পস্তবক দিয়ে সংহতি জানান যুব সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুপ্রিয় ভট্টাচার্য এবং ছাত্র সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড আবু সাঈদ। তাঁরা দাবি জানান, অবিলম্বে পার্শ্বশিক্ষকদের সমকাজে সমবেতন দিতে হবে এবং তাঁদের শিক্ষকের পূর্ণ মর্যাদা দিতে হবে।

গুজরাট নাকি 'ভাইব্র্যান্ট'!

এ দেশের সবচেয়ে ধনী পাঁচ জনের মধ্যে চার জনই গুজরাটের মানুষ। ২০১৯ সালে অতি ধনীদের যে তালিকা তৈরি করেছে ফোর্বস, সেখানে রয়েছে এই তথ্য। ধনকুবেরদের মধ্যে টানা ১২ বছর ধরে এক নম্বর স্থানটি রয়েছে মুকেশ আম্বানির দখলে। তালিকায় তার পরেই উঠে এসেছে শিল্পপতি গৌতম আদানির নাম। এছাড়া পালনজি মিস্ত্রি ও উদয় কোটাকের নাম রয়েছে তালিকার চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে।

সবই ঠিক ছিল। ২৫ বছর ধরে গুজরাটে ক্ষমতায় রয়েছে 'আচ্ছে দিন'-এর মহান কারিগর বিজেপি। তাদের উন্নয়নের মডেল রাজ্য— সাধের 'ভাইব্র্যান্ট গুজরাট'-এর তো এমন ঝলকই দেখাবার কথা! কিন্তু মুশকিল করেছে খোদ বিজেপি রাজ্য সরকারেরই একটা তথ্য। বিধানসভায় পেশ হওয়া সেই সরকারি তথ্য বলছে, 'ঝলমলে' গুজরাটের ১ লক্ষ ৪২ হাজারেরও বেশি শিশু চরম অপুষ্টিতে ভুগছে। হিসাবের খাতার বাইরে যে রয়ে গেছে আরও বহু, তা বলাই বাহুল্য। স্বাভাবিক ভাবে আদিবাসী অধ্যুষিত দাহোড় ও নর্মদার মতো জেলাতেই রয়েছে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক অপুষ্ট, রুগ্ন শিশু। কিন্তু ছবিটা বিশেষ অন্য রকম নয় আনন্দ-এর মতো সমৃদ্ধ এলাকাতেও। ধনী প্রবাসী গুজরাটিদের বাস এই আনন্দে। কিন্তু সরকারি তথ্যে দেখা যাচ্ছে, এ হেন আনন্দেও ছ'হাজারের বেশি বাচ্চা অপুষ্টির শিকার।

শুধু শিশু-অপুষ্টিই নয়, ২০১৮-র একটি হিসাবে দেখা যাচ্ছে, আগের দু'বছরের তুলনায় সে বছরে দারিদ্রসীমার নিচে নেমে যাওয়া পরিবারের সংখ্যা বেড়েছে এক-আধটা নয়, প্রায় ১৯ হাজার। সরকার নিজেই বিবৃতি দিয়েছে, গুজরাটে দারিদ্রসীমার নিচে থাকা পরিবারের সংখ্যা ৩১ লক্ষ ৪৬ হাজার ৪১৩টি। পরিবারপিছু সদস্যসংখ্যা গড়ে ৫ জন হলে রাজ্যে খেতে না-পাওয়া মানুষের সংখ্যা দেড় কোটিরও বেশি। গোটা দেশ জুড়ে আজ বেকারির ভয়ঙ্কর থাবা, নোটবন্দি ও জিএসটি যা আরও বাড়িয়েছে। গুজরাটও ব্যতিক্রম নয়। ফলে গত এক বছরে হতদরিদ্র মানুষের সংখ্যাটা সেখানে যে আরও বেড়েছে বৈ কমেনি, তা বলাই যায়।

উন্নয়নের মডেল রাজ্য 'ভাইব্র্যান্ট গুজরাটে'র আসল চেহারা তাহলে এই! ২৫ বছরের শাসনে বিজেপি তাহলে সেখানে এ হেন 'রামরাজ্য'ই স্থাপন করেছে, যেখানে উন্নয়নের সমস্ত সুফল শুষে নিচ্ছে হাতে-গোনা কয়েকজন ধনকুবের, আর খালি পেটে, ছেঁড়া জামাকাপড়ে ফুটপাতে দিন গুজরান করছে লক্ষ লক্ষ মানুষ, খুঁটে খাচ্ছে ডাস্টবিনের খাবার!

(সূত্র ঃ টাইমস অফ ইন্ডিয়া-২৪ মার্চ, '১৮ এবং পিটিআই-৯ জুলাই, '১৯)

বাঙ্গালোরে শিক্ষা কনভেনশন

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১৯ বাতিলের দাবিতে ২২ অক্টোবর কর্ণাটকের বাঙ্গালোরে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি এবং এ আই ডি এস ও-র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এক শিক্ষা কনভেনশন। ছবি ঃ কনভেশনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের একাংশ।

১০০ দিনের কাজে বঞ্চনা ঃ তুফানগঞ্জে বিক্ষোভ

৭ নভেম্বর এ আই কে কে এম এস-এর কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ ১ নং ব্লক কমিটির উদ্যোগে ১০০ দিনের কাজের দাবিতে বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখানো হয়। অভিযোগ ৪ (ক) ফর্ম ফিলআপ করে আবেদন করার পরেও চিলাখানা ১ নং অঞ্চলে কোনও কাজ দেওয়া হচ্ছে না। চিলাখানা ২ নং অঞ্চলে ৪(ক) ফর্ম পূরণ করে প্রধানকে দেওয়া হয়। কিছু মানুষের কাজ হলেও আবেদনকারী সমস্ত মানুষ কাজ পাননি। দেওচড়াই অঞ্চলে শতাধিক মানুষ উক্ত ফর্ম নিয়ে গেলে সেই ফর্ম জমা নিতে অস্বীকার করেন অঞ্চল প্রধান, যা সম্পূর্ণ আইন বিরুদ্ধ। এর প্রতিবাদেই ছিল বিডিও অফিস অভিযান। এ দিন দুই শতাধিক মানুষের মিছিল শহর পরিক্রমা করে বিডিও চত্বরে উপস্থিত হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক কমরেড দেবেন্দ্রনাথ বর্মন, ব্লক সম্পাদক কমরেড অশ্বিনীকুমার বর্মন, কমরেড রবিয়া সরকার প্রমুখ। বিডিও দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং দ্রুত দাবি পূরণের আশ্বাস দেন।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com